মিশনের হীরক জয়ন্তী
এবং মিশন বার্তার ৪ দশক পূর্তিতে
বিশেষ সংখ্যা

আহ্ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ■ সংখ্যা ১ ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

SERVING HUMANITY
DAM
60 YEARS
Dhaka Ahsania Mission

মানবসেবায়
৬০ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shormin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yesmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Najneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

Dr. Rowshon Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Sharmin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Momtahena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪০ ❑ সংখ্যা ১ ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

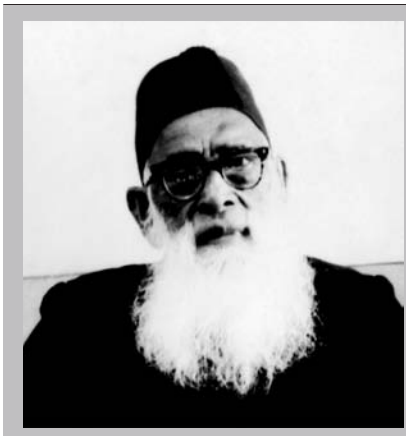

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে পা দিল ৬১ বছরে। পূর্ণ করল ৬০ বছর। সেবাধর্মী এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মানুষের কল্যাণ সাধনে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফি-সাধক, সিদ্ধপুরুষ, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এই মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'- এই মূলমন্ত্র নিয়ে। এটি ছিল তাঁরই জীবনাদর্শ ও কাজের ভিত্তি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা ও মানবাধিকার নিয়েই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে মিশন। দীর্ঘ এই সময়ে মিশনের প্রধান অর্জন এক বাক্যে বলতে হবে– মানুষের মুখের হাসি। পৃথিবীর সব পদক, সব পুরস্কার ওই হাসির কাছে তুচ্ছ। মানুষের ভালোবাসা আর মুখের হাসি মিশনের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

এবারের সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে সাজানো হয়েছে। বিশিষ্টজনদের লেখা রয়েছে এতে। প্রত্যেকটি লেখায় মিশনের প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ও মিশনের কর্মধারার ওপর আলোকপাত করেছেন লেখকরা। আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক-২০১৬ প্রাপ্ত অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন মিশনের

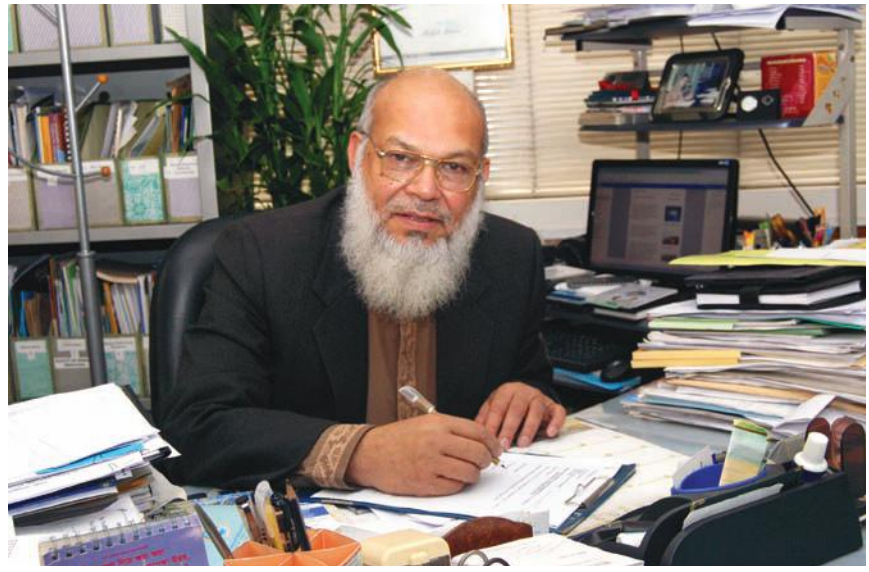

কাজী রফিকুল আলম

কৃতিত্বের অনেক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ড. আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সঙ্গে তার তিন পুরুষের পরিচয়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য মিশনকে মানবতার সেবায় আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিজ্ঞান ভাবনা তুলে ধরেছেন অধ্যাপক ড. এম. শমশের আলী আর শিক্ষা ভাবনা ব্যাখ্যা করেছেন মো. আবদুল মজিদ।

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা প্রকাশনার ৪০ বছর শুরু হলো। সংকট আর সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই অব্যাহত রয়েছে এ অগ্রযাত্রা। এ নিয়ে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা।

এবার নিয়মিত বিভাগগুলো প্রকাশ করা গেল না। সারা দেশে মিশনের ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ও অন্যান্য কর্মধারার খবর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। আপনাদের সকলকে জানাই ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদকীয় পরিষদ
কাজী আলী রেজা
আ. শ. ম. বাবর আলী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আমিনুল হক

২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন
আ. শ. ম. বাবর আলী
৩

৬০ বছর পূর্তি উদযাপন
মো. সাইফুল ইসলাম
৪

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সঙ্গে আমার তিন পুরুষের পরিচয়
ড. আনিসুজ্জামান
৬

আহ্ছানিয়া মিশনের কৃতিত্বের অনেক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
৮

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিজ্ঞান ভাবনা
প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
১১

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাদর্শন
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
১৪

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানবতার সেবায় আদর্শ প্রতিষ্ঠান
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য
১৬

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন
মো. আনিসুল কবির জাসির
১৯

মিশন বার্তার ৪০ বছর
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
২০

কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
২২

প্রকৌশল শিক্ষায় আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাকীবির রব / সৈয়দা শবনম হাসান
২৬

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, উত্তরা – একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন
মো. ইফতেখারুল ইসলাম
২৮

আমিক ৩৬০
ইকবাল মাসুদ
৩০

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী
এম. জাহাংগীর হোসেন
৩২

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
প্রফেসর ফাতেমা খাতুন
৩৪

আলোকিত বাংলাদেশ
এস. এম. নজমুদ্দীন
৩৬

মিশন সংবাদ
৩৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি: রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ একজন শিক্ষার্থীকে মেডেল প্রদান করছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ২০১৫ সালে; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল ৯ এপ্রিল ২০১৪; মিশনের আলাপ পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি উৎসবের মঞ্চে অতিথিদের কয়েকজন; মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি- ১৯, সড়ক- ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এবং মিশন

আ. শ. ম. বাবর আলী

১৯২৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জন্মভূমি নলতায় এসে শুরু করেন তাঁর অবসর জীবন। এ সময় তাঁর আধ্যাত্ম জীবনসাধনা অব্যাহত রেখেও সর্বশ্রেণির জনগণের কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'– এই মূলাদর্শ নিয়ে ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ তারিখে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর কিছু ভক্তবৃন্দ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন'।

ওই একই মূলাদর্শে ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'। আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার মূলে ৭টি লক্ষ্যকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্ত লক্ষ্যগুলোই আহ্ছানিয়া মিশনের দর্শন হিসেবে বিবেচিত। মূলনীতি হিসেবে লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে– ১. সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা, ২. মানুষে মানুষে পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করা, ৩. মানুষে মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধন ও আত্মিক প্রেমে উদ্দীপ্ত করা, ৪. প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করা এবং অহংকার পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া, ৫. প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম করা, ৬. প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম করা এবং ৭. নিপীড়িত মানব জাতির প্রতি যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করা। উল্লেখ্য যে, এই সাতটি মূলনীতিকে সমন্বয় করে তাকে দুটি ভাগে বিভাজনকরত নির্দিষ্ট করেন মিশনের মূলাদর্শ– 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনের এ দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। স্রষ্টার এবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের খোদা দয়ার সাগর, ক্ষমার প্রস্রবণ, আমাদের নবী মহব্বতের প্রতিমূর্ত্তি, মহৎ গুণের অবতার, ক্ষমাশীলতার আদর্শ, আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত, কর্মজীবনের কর্ণধার, জীবনের পথ প্রদর্শক, দেহী হইয়া ঐশ-জ্যোতিতে ভরপুর, দেহী হইয়াও তিনি খোদায়ী নূরের প্রতিভাস, আমাদের দীন দুনিয়ার কান্ডারী, আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহলোক ও পরলোকের বাদশা, শেষ মুক্তির কারণ।' –মিশন প্রতিষ্ঠাতার গুজারেশ।

মিশন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক দর্শন ছিল এটাই। আর এই প্রাথমিক দর্শনে মিশন-সদস্যদেরকে প্রতি আশা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমি চাই আপনাদেরকে খোদার আশেক দেখিতে, রাছুলের সত্যের বর্ত্তিকা লইয়া ভ্রমান্ধকার ঘুচাইতে, মহব্বতের বন্ধনে সারা জাহানকে আবদ্ধ করিতে ও পরম আনন্দ, পরম শান্তি দুই হাতে বিলাইতে।' – প্রাগুক্ত। অর্থাৎ জগতের সকল মোহ ত্যাগ করে ধর্মের অনুসরণে স্রষ্টা ও তাঁর সকল সৃষ্টেরে প্রতি মহব্বত সৃষ্টির মাধ্যমে অজ্ঞানতা-অন্ধকার থেকে সত্যালোকের পথগমনের দিক্‌নির্দেশনাই মিশনের অন্যতম দর্শন হিসেবে বিবেচিত। মিশনের এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি এর সদস্য তাঁর ভক্তদেরকে তিনি এই বলে আহ্বান করেছেন, 'আপনারা কর্মী হউন, তর্ক ও বক্তৃতা ভুলে যান, সারা বিশ্বের সেবা করুন। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতাকে বিসর্জন দিয়া শ্রমিকের সাজ লইয়া তরীকতের শৃংখলে সবাইকে বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া সমাজকে গৌরাবান্বিত করুন।' –প্রাগুক্ত। অর্থাৎ শুধুমাত্র একক ধর্মীয় কিংবা একক দেশীয় গন্ডিতে মিশনের দর্শন আবদ্ধ নয়, পরিব্যাপ্তি তার সর্বধর্ম থেকে সারা বিশ্ব বলয়ে। বিশ্বের সর্বস্থলে সর্ব মানুষের জন্য এবং তা সত্য-সুন্দর জীবন ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

এগুলো তো গেল, মিশনের ধর্মদর্শন। তাছাড়া মানবের বাস্তব জীবনের অনুষঙ্গও আহ্ছানিয়া মিশনের অন্যতম দর্শন। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সেই দর্শনকে উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিবে না, কাহারও গীবত করিবে না এবং কাহারও অন্তরে ব্যথা দিবে না। সত্য বলিবে, সততা অবলম্বন করিবে ও শত্রুকে মিত্রতা দ্বারা বশীভূত করিবে। রোগ শোক সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিবে।' –আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি।

মিশনের এই পার্থিব দর্শনকে আরও একটু বিস্তৃত করে একই নিবন্ধে তিনি বলেন, 'সত্য কথন, সত্য প্রচার, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ লাভ করিবে। ... স্বার্থের জন্য কাহারও নিকট হস্ত প্রসার করিবে না। ...নিজকে ক্ষুদ্রতম মনে করিবে, কাহাকেও তুচ্ছ বা ঘৃণা করিবে না– সে নফর হউক, ভক্ত হউক বা শিষ্য হউক। ...সুকথা ও সুকার্য দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি বিধান করিবে এবং কুকথা ও কুকার্য দ্বারা কাহারও অন্তরে ব্যথা দিবে না।'

মিশনের এ সাংবিধানিক দর্শন প্রতিভাত হয়েছে ভক্তবৃন্দের কাছে লেখা তাঁর অজস্র চিঠিপত্রে। যেমন, তাঁর লেখা 'ভক্তের পত্র' গ্রন্থের ৩১ সংখ্যক পত্রে– 'প্রাণ মন ঠিক করিয়া সমতানে, সমভাবে, সমজ্ঞানে সেই পরম আরাধ্যকে আহ্বান করুন।' ৫০ সংখ্যক পত্রে– 'সহিষ্ণুতার ভেলা অবলম্বন করিয়া সংসার বারিধি সন্তরণ করিয়া যান। গর্ব্ব-প্রতিহিংসা, সম্ভ্রম লাভের ইচ্ছা, খ্যাত-ধন, মান, পুত্র-কন্যা সকলকে ভুলিয়া কেবলই সন্তরণ দিতে থাকুন।' ১৯৪ সংখ্যক পত্রে– 'ক্রোধ, ঈর্ষা, হাস্তিকে রোক্‌সোদ করিতে হইবে।' 'প্রেমিকের পত্রাবলী'র ২৪ সংখ্যক পত্রে– 'মিথ্যা কথা, লোকের অপবাদ, অত্যাচার, অসত্য, ঈর্ষা ও দ্বেষ হইতে সতত নিজেকে বাঁচাইবে।' ১৩৭ সংখ্যক পত্রে– 'আত্মার শক্তি দ্বারা কুপ্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা বশীভূত রাখতে হবে।

আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক ভক্তের কাছে লেখা এক চিঠিতে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেন, 'আহ্ছানিয়া মিশন নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিবারণকরণ।' –আমার শিক্ষা ও দীক্ষা: পৃ-৩৮।

বাস্তবিকভাবে মিশনের দর্শন পার্থিব ও পারলৌকিক শান্তির পাথেয়ও বটে এবং তা সকল ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য।

অন্যভাবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর গোটা জীবনের যে সাধনা ও দর্শন, তারই নির্দেশিত অনুসরণীয় প্রতিচ্ছবিই আহ্ছানিয়া মিশনের দর্শন। আর সেই দর্শনকে সম্মুখে স্থাপন করেই তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিব্যাপ্তি আজ স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

আ. শ. ম. বাবর আলী, কন্সালটেন্ট (প্রকাশনা), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

৬০ বছর পূর্তি উদযাপন

মো. সাইফুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অতীতের অর্জন ও ভবিষ্যতের কর্মরেখা প্রণয়নের অনুপ্রেরণা হিসেবে ২০১৮ সালে ৬০ বছর পূর্তি স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলছে বছরব্যাপী আয়োজন। ইতোমধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।

মিশন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন : প্রথম অনুষ্ঠানটি ছিল সার্বিক আলোচনা। মিশন প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণে রেখে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ও সাতক্ষীরার হাদিপুর অফিস থেকে যৌথভাবে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। সাতক্ষীরায় আলোচনায় অংশ নেন মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে আলোচনায় অংশ নেন মিশনের কর্মসূচি বিভাগের পরিচালক ড. খাজা শামশুল হুদা, কোষাধ্যক্ষ ড. আবদুল মজিদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ ও অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ৬০ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মিশনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্যান্সার হাসপাতাল, মাদক নিরাময় কেন্দ্র পথশিশুদের জন্য শিশুপল্লী প্রভৃতি। আগামীতে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এক নম্বরে থাকবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. এমএইচ খান বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এটির উত্থানের একমাত্র কারণ হলো 'সততা'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হীরকজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ২০১৮। প্রতিবছরের ন্যায় ২০১৮ সালেও বছরের প্রথম দিনে ইংরেজি নর্ববর্ষকে বরণ করে নেয়া হয়। একই সাথে উদ্বোধন হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পথচলার ৬০ বছর পালনের কর্মসূচি। উদ্বোধনীর এই দিনে সামাজিক মাধ্যম ও ওয়েবভিত্তিক প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধনও করা হয়।

এসডিজি সেমিনার

২৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে জেন্ডার সমতা অর্জন শীর্ষক এসডিজি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ডাম প্রতিষ্ঠার হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মূল আলোচকের বক্তব্যে স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার বলেন, জেন্ডার সমতা অর্জনে রাষ্ট্রকে বৈষম্য নিরসনে আইন প্রণয়ন করতে হবে, নারীরা যে অবদান রাখছে তার স্বীকৃতি দিতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের আরও ব্যাপকভাবে নিয়ে আসতে হবে। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেন্ডার সমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ডামের জেন্ডার ফোকাল ফেরদৌসী আক্তার এবং সভাপতিত্ব করেন ডামের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ড. খাজা শামসুল হুদা।

হীরকজয়ন্তীর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

৩ মার্চ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হলো মিলনমেলা। এ মেলায় যোগ দেন মিশনের বর্তমান ও সাবেক কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএইচ খান অডিটরিয়ামে এ উৎসবের

মিশন প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণে রেখে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় ৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ও সাতক্ষীরার হাদিপুর অফিস থেকে যৌথভাবে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

৬০ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্টসহ মিশন কর্মীবৃন্দ

আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত উৎসবটি তিন পর্বে বিভক্ত ছিল–অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ, ভিডিও কনফারেন্সে দেশ-বিদেশের শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বেলুন ওড়ানো।

স্বাগত বক্তব্যে মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান বলেন, ৬০ বছরে এসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকাণ্ড অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এটি বর্তমানে আটটি সেক্টরে কাজ করছে।

মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিলে যেকোনো প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। মিশনের শুরুর দিকে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার পদাঙ্ক এখনও আমরা অনুসরণ করি।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. এমএইচ খান বলেন, শিক্ষা ও মানবতার সেবা নিয়ে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড অবিস্মরণীয়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ কার্যক্রম শুধু দেশে নয়, বিদেশেও বিস্তৃত। আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

পুনর্মিলনীতে অতিথিদের সঙ্গে কাজী রফিকুল আলম, ড. খলিলুর রহমান ও ড. কাজী শরিফুল আলম

ভিডিও কনফারেন্সে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থেকে আমেনা বেগম সেতু নামে মিশনের এক মাঠকর্মী বলেন, মিশনের সহায়তায় এলাকায় সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে আমি মিশনের সফলতা কামনা করছি।

এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান, মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান, মিশনের কর্মসূচি বিভাগের সাবেক পরিচালক শফিকুল ইসলাম, হেলপ এজ ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর রাবেয়া সুলতানা, সেভ দ্য চিলড্রেনের এডুকেশন অ্যাডভাইজার ম হাবিবুর রহমান, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম প্রমুখ।

এ ছাড়াও গত ২০ জানুয়ারি 'স্রষ্টার সাযুজ্য লাভ ও সৃষ্টের সেবা', ২৫ জানুয়ারি 'সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সহজলভ্য করা', ২৪ ফেব্রুয়ারি 'মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো', ২৫ মার্চ 'ক্ষুধা মুক্তি' এবং ৩১ মার্চ 'নারী শিক্ষা ও সমাজ সংসারে নারীদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক: *জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

৩ মার্চ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হলো মিলনমেলা। এ মেলায় যোগ দেন মিশনের বর্তমান ও সাবেক কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএইচ খান অডিটরিয়ামে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সঙ্গে আমার তিন পুরুষের পরিচয়

ড. আনিসুজ্জামান

অর্থনীতি, শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ২০১৬ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এমএইচ খান মিলনায়তনে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তার হাতে এ পদক তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী ড. আনিসুজ্জামান।

সমকালীন কৃতী ব্যক্তিত্বদের প্রতিভা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কর্মের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচিত করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ের একজন ব্যক্তিত্বকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার এ পদক পেলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. আনিসুজ্জামানের বক্তব্য পত্রস্থ হলো।

ড. আনিসুজ্জামান

শিক্ষা, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্য খাতে এ মিশনের ভূমিকাকে আমি গৌরবোজ্জ্বল বলব। খানবাহাদুরের ঐতিহ্য তারা যে প্রকৃতপক্ষে অবলম্বন করেছেন এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তার পরিচয় তাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

আমি যদি বলি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সঙ্গে আমার তিন পুরুষের পরিচয়, তাহলে সেটি গল্পের মতো শোনাবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মখদুমী লাইব্রেরি থেকে আমার দাদার সব বইপুস্তক প্রকাশিত হতো। পঞ্চাশের দশকে যখন এ প্রকাশনা সংস্থা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়, তখন এর নতুন নামকরণ হয় 'মখদুমী লাইব্রেরি ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউস'। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

আমার আব্বা বয়সে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন, প্রায় এক পুরুষের ব্যবধান হবে। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সৌহার্দ ছিল। সে সুবাদে ছেলেবেলায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং তার স্নেহ ও দোয়া লাভের সুযোগ হয়েছে।

আত্মজীবনীতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেকে বলেছেন nothing। কিন্তু আমরা জানি, তার জীবনে যা কিছু অর্জন, তা খুবই অসাধারণ। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় সামান্য অবস্থা থেকে Indian Educations 77-এর সদস্য হতে পেরেছিলেন এবং বাংলায় মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আগামী বছর ৬০ বছর পূর্ণ করবে। শিক্ষা, সমাজসেবা ও স্বাস্থ্য খাতে এ মিশনের ভূমিকাকে আমি গৌরবোজ্জ্বল বলব। খানবাহাদুরের ঐতিহ্য তারা যে প্রকৃতপক্ষে অবলম্বন করেছেন এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, তার পরিচয় তাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আমি মিশনকে, বিশেষ করে এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান আমাদের সবার কাছেই সুপরিচিত। নতুন করে তার সম্পর্কে আর কিছুই বলার নেই। ভারত ও ইংল্যান্ডে পড়াশোনা শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর থেকেই তিনি

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন প্রথমে দলীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করে। এ কথা হয়তো বলা যেতে পারে, আওয়ামী লীগের যে ছয় দফা রয়েছে, তাতে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের দলীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব একটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক রেহমান সোবহান বিদেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়েছেন। বিদেশে শিক্ষিত ও নাগরিক সমাজে তার এসব বক্তব্য তখন খুব গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল এবং সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি বড় অর্জন ছিল।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যেমন বলেছেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জ্ঞানচর্চা নিবেদিত হয়েছে মূলত মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। এখন পর্যন্ত তিনি যা লিখছেন, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, প্রধানত সে চিন্তা মাথায় রেখেই। এ দেশের সম্পদ যেন অল্প কিছুসংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত না হয়, এটি যেন সমাজের সর্বত্র বিস্তার লাভ করতে পারে, এটিই তার ধ্যান ও জ্ঞান এবং এ বিষয়ে তিনি তার সব বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োগ করেছেন।

তিনি এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত উঁচু দরের বিদ্বান হয়েও সাধারণ মানুষের কল্যাণে তার সবকিছু উৎসর্গ করছেন। আজকে আহ্ছানিয়া মিশন তাকে সম্মান জানিয়েছে। এজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহানকেও আমি অভিনন্দন জানাই। তার অনেক পুরস্কারের সঙ্গে আরও একটি যুক্ত হলো।

আমি আশা করি, আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জীবনকে ঘিরে থাকবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের জ্ঞানচর্চা নিবেদিত হয়েছে মূলত মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। এখন পর্যন্ত তিনি যা লিখছেন, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, প্রধানত সে চিন্তা মাথায় রেখেই।

আহ্ছানিয়া মিশনের কৃতিত্বের অনেক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

অর্থনীতি, শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ২০১৬ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এমএইচ খান মিলনায়তনে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তার হাতে এ পদক তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী ড. আনিসুজ্জামান। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য পত্রস্থ হলো।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান

মহান বিদ্বান ও লোকহিতৈষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার স্মৃতিতে উৎসর্গ এ অসাধারণ পুরস্কার পেয়ে আমি কতটা গর্বিত ও বিনয়ী বোধ করছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

আপনাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই আছেন, যাদের এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা রয়েছে। তারা জানেন যে, আমার মাতৃকুল থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহ এবং আমার পিতৃকুল থেকে দেওয়ান ফজলে রাব্বী আমার পূর্বপুরুষ, যারা নিজেদের উৎসর্গ করে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এ মহান মিশনে অংশ নিয়েছিলেন। এজন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আমাদের পরিবারে অতি পরিচিত ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এর কারণ হলো, তারা যখন শিক্ষা বিস্তারের এ মিশনকে জাতীয় পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত থেকে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের সামগ্রিক ধারণা ও মতামত দিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমার পূর্বপুরুষ ও খানবাহাদুর স্যার স্বাধীন ভারতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার বাস্তবতা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ছিল এ উদ্বেগের প্রথম বিষয়। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তারা আগেই সতর্ক করেছিলেন। তখনকার সে তথ্যাদি সংখ্যা ও আকাঙ্ক্ষার আনুপাতিক হারে শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যার ফলে নওয়াব আবদুল লতীফসহ সেসব ব্যক্তি প্রথম দিকের বছরগুলোতে অত্যন্ত সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা বিভাগে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। একটি বাস্তবতা এর সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হয়েছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সংগ্রামকে বেগবান করতে আমরা জনাব বাজিকের কাছ থেকে একটি দূরদর্শিতামূলক অনুদান পেয়েছিলাম। এর ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য এটি ছিল তার (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার) সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বেশ কয়েক বছর পর।

> যাত্রা শুরুর পর তখন এটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচারণা ছাড়াই নীরবে এগোচ্ছিল। অন্যান্য এনজিও, যেমন- ব্র্যাক অথবা অন্যান্য সংস্থা, যেমন- গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেমন প্রচারণা হয়েছিল, সে রকম কিছুই নয়।

তিনি এমন একটি প্রথাগত বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, যেখানে মানুষ প্রতিদান বা খ্যাতির প্রত্যাশা ব্যতিরেকে মানবসেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। আত্মনিবেদনের ফল দেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরবর্তী জীবনে তিনি মানবসেবা ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন এবং বাকি জীবন মানবসেবায় ব্যয় করেন। অবশেষে তার ঐতিহাসিক অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা আজ যা দেখছি, তা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনেই নিহিত রয়েছে।

নিজেদের প্রচেষ্টার ফল দেখার সৌভাগ্য অনেক মানুষেরই হয় না। এটি একটি বিরল সৌভাগ্য যে, আপনার স্বপ্ন এ মহান প্রতিষ্ঠানের কর্মের মধ্যদিয়ে আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। শুধু তার জীবদ্দশাতেই নয়, বরং বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ এবং পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার নাম গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অবশ্যই একটি বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান। এর প্রেসিডেন্ট 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে'র কার্যক্রমে আমাদের সঙ্গে সবসময় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি এবং দেবপ্রিয়ও এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। 'একজনও পিছিয়ে থাকবে না' এর এজেন্ডার প্ল্যাটফর্মে আমরা তুলে ধরব যে, অঙ্গীকার ও আত্মনিবেদনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো একটি সংস্থার চেয়ে ভালো অংশীদার আর কোনটি হতে পারে?

এ সংস্থার উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ দেখার সৌভাগ্য আমার নিজেরও হয়েছে। আমার মনে পড়ে, প্রথম বছরগুলোতে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭০ এর দশকে এর প্রারম্ভিক বিকাশ পর্বের কথা। যাত্রা শুরুর পর তখন এটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচারণা ছাড়াই নীরবে এগোচ্ছিল। অন্যান্য এনজিও, যেমন- ব্র্যাক অথবা অন্যান্য সংস্থা, যেমন- গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেমন প্রচারণা হয়েছিল, সে রকম কিছুই নয়।

আমি এখানে একটি অসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আছি। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। এতে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। প্রযুক্তিতে দক্ষ হাজার হাজার মানুষ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজন মেটাবে। এটি স্বতন্ত্রভাবে খানবাহাদুর স্যারের রূপকল্পের একটি অংশ হতে পারে। এখান থেকে আপনি শুধু সুশিক্ষিত বাঙালির ধারাবাহিক প্রজন্মই পাবেন না, বরং প্রযুক্তিতে দক্ষ বাঙালির ধারাবাহিক প্রজন্মও আপনি পাবেন। তারা যেখানে সেবা প্রদান করবে, সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থেকে সে সমাজ উন্নয়নে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আহ্ছানিয়া মিশনের কৃতিত্বের অবশ্যই অনেক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তবে ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তারা যে অসাধারণ কাজ করেছেন, এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। এটি আধুনিক সুবিধাসংবলিত একটি হাসপাতাল। তারা এমন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন, যা বাংলাদেশের জনগণ পায় না। আপনি স্বল্পমাত্রায় এ জাতীয় সেবা কিছু হাসপাতালে হয়তো পেতে পারেন। এটি একবিংশ শতাব্দীর আত্মনিবেদিত একটি হাসপাতাল বলেই এ জাতীয় সেবা প্রদান করতে সক্ষম। শুধু সাময়িকের জন্যই নয়, বরং বছরের পর বছর মানুষ এটিকে মনে রাখবে। এ জটিল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তারা এর হাজার হাজার সুবিধাভোগী ও তাদের পরিবারের কৃতজ্ঞতা, দোয়া ও ভালোবাসা পাবেন।

আহ্ছানিয়া মিশনের একটি মহান অবদান ও উদ্ভাস হলো এই ক্যান্সার হাসপাতাল। তারা এমন চিকিৎসা-সুবিধা প্রদান করছেন, যা স্বল্প আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে। আমাদের সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা যারা দুর্ভাগ্যবশত ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছেন অথবা তাদের পরিবারের কোনো সদস্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, চিকিৎসার জন্য তারা সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক অথবা ভারতের বিভিন্ন স্থানে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যেও যেতে পারেন। অথচ হাজার হাজার, লাখ লাখ জনগণ রয়েছে, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, কারণ তাদের সেই আর্থিক সঙ্গতি নেই।

এ জটিল স্বাস্থ্যসেবাটি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া যাবে, যেটির শুধু উত্তম হাসপাতালের যোগ্যতাই নেই, বরং সমাজের সতীর্থ সদস্য সাধারণ জনগণকে এ সেবা প্রদানে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধও বটে। তাদের রয়েছে এ বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের মূল্যবোধ যে, তারা সমাজের সবচেয়ে অভাবী লোকজনের প্রতি সামান্য কর্তব্য পালন করছেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি মানবিক সেবায় অসাধারণ অর্জনের জন্য আমি আবারও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন ব্যক্ত করছি।

আমি এখানে বলতে চাই, আমার সহকর্মী দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যে কথা বলেছেন, আমি পেশাজীবনের কয়েক মাস ব্যয় করেছি দারিদ্র্য ও অবিচারের সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে এবং সমাজের স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্যদের বঞ্চনার সমস্যা নিয়ে লিখি। একসময় আমি পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের জনগণের বঞ্চনা নিয়ে কাজ করেছি। এখন আমার বয়স ৮২ বছর। আল্লাহর ইচ্ছায় আর কয়েক মাস পরই আমি ৮৩তম জন্মদিন পালন করব। জীবনসায়াহ্নে এসে আমার কর্মজীবনের দিকে ফিরে তাকালে এখনও দেখতে পাই, যা কিছু অর্জন করেছি অথবা জনগণের জন্য যেটি করতে পেরেছি, সেটি হলো আমরা সমস্যাগুলোর প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য আমার নির্ধারিত কাজে আমি শুধু সমস্যাগুলো শনাক্ত করতেই আগ্রহী ছিলাম না, বরং প্রেসিডেন্ট বরাবর যে প্রতিবেদনগুলো দাখিল করেছি তাতে পরিপূর্ণ ধারণা দিয়েছি। সে ধারণাগুলো ছিল সাম্যবাদী সমাজ

'একজনও পিছিয়ে থাকবে না' এর এজেন্ডার প্ল্যাটফর্মে আমরা তুলে ধরব যে, অঙ্গীকার ও আত্মনিবেদনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো একটি সংস্থার চেয়ে ভালো অংশীদার আর কোনটি হতে পারে?

গঠনের নিমিত্তে একগুচ্ছ বাস্তব ধারণা। এর কিছু কিছু স্বল্প পরিসরে আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়ন করাও সম্ভব।

অবশেষে আমি নিজে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যা করতে পারি তা হলো, ধারণা বিনিময়। এ ধারণাগুলোর শেষ ফলাফল কখনও সঠিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম; অবশেষে সেটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সংগ্রামে আমার প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আজ এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমরা একত্রে এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি; আমাদের সঙ্গে ৪০ জনের বেশি সৈনিক ছিলেন। এটি ছিল আমাদের অসামান্য অর্জন।

যদিও আমি অনেক ধারণা দিয়েছি; কিন্তু আমার বাকি জীবনের কর্ম মূলত একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ার ধারণা। কিছুটা উন্নয়ন হলেও এ দাবি করতে পারব না যে, আমরা আমাদের কর্মে সফল হয়েছি। এ স্বপ্ন ও প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করতে এখনও অনেক কিছু করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকাণ্ডকে আমি ঈর্ষা ও কৃতজ্ঞতা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি। এর মতো আরও কিছু মহৎ সফল মানবহিতৈষী সংস্থা রয়েছে, যেমন- গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক এবং এরকম অন্যান্য সংস্থা, যেগুলোর জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। সমাজ পরিবর্তনের মতো বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সময়ে জনগণের প্রতি আপনাদের অবদান সফল হতেও পারে, আবার না-ও পারে। তবে দেশের লাখ লাখ সহজ-সরল বঞ্চিত নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য।

একসময় আমার বয়স যখন কম ছিল, তখন বিপ্লবী পরিবর্তনে আমার সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল। আমরা ধৈর্যের সঙ্গে দেখেছি এবং বঞ্চিত ও অসম সমাজের ক্ষতগুলো আরোগ্যের চেষ্টা চালিয়েছি মাত্র। আজ এ বুড়ো বয়সে আমি যা করতে পারি, তা হলো শুধুই আপনাদের কাজের মূল্যায়ন। অবশেষে আপনাদের অবদানের ফল দেখতে পাবেন। এর প্রভাব শুধু হাজার হাজার নয়, বরং লাখ লাখ মানুষের জীবনে পড়বে এবং আপনাদের অবদানে তাদের জীবনের উন্নতি হবে। আমি মনে করি, আপনারা সবচেয়ে মহৎ অবদান রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো পুরো পৃথিবী পরিবর্তন করতে পারব না, তবে এ পৃথিবীতে যখন এসেছিলাম, তখনকার চেয়ে অন্তত পক্ষে একটু হলেও ভালো অবস্থানে রেখে যেতে পারব। আমি মনে করি, এটিই গর্ব ও স্মৃতিচারণের সবচেয়ে মহৎ উৎস।

তাই বলতে পারি যে, আমি এক মহান শিক্ষাবিদ ও মানবহিতৈষীর স্মৃতিতে উৎসর্গ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এ স্বর্ণপদক পেয়ে নিজেকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, মনুষ্যত্ব এবং সত্যি বলতে কী সম্মানিত বোধ করছি। এতে রয়েছে তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার গভীর ছাপ, যার ফলে এরকম একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, যার রয়েছে বিশাল অর্জন এবং যেটি বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য অনেক কিছুই করছে।

> ‘একজনও পিছিয়ে থাকবে না’-এর এজেন্ডার প্ল্যাটফর্মে আমরা তুলে ধরব যে, অঙ্গীকার ও আত্মনিবেদনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো একটি সংস্থার চেয়ে ভালো অংশীদার আর কোনটি হতে পারে?

স্বর্ণপদকের সঙ্গে প্রদত্ত এ ছোট আর্থিক অনুদানটি আমি প্রতীচী ট্রাস্ট অব বাংলাদেশের জন্য উৎসর্গ করছি, যেটির আমি চেয়ারম্যান। এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন আমার বন্ধু ও অর্ধশতাব্দীর সহকর্মী, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেনের মহান অবদান হলো, তিনি যখন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে বড় অঙ্কের আর্থিক সুবিধা লাভ করেন, তখন সেটি শুধু তার নিজ দেশ ভারতের সঙ্গে ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নেননি, বরং তার পূর্বপুরুষের দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য আমরা সবাই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাই যখনই আমি সামান্য আর্থিক অনুদান পাই সেটি নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তবে বাংলাদেশের নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে তার প্রচেষ্টায় আমি সামান্য অবদান রাখতে চাই। এ কারণে আমি এ আর্থিক অনুদানটি প্রতীচীর জন্য উৎসর্গ করলাম।

অতএব, আমি আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী রফিকুল আলমকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে এবং ধন্যবাদ জানাই যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদের সবাইকে।

আমি এ স্বর্ণপদকটি সযত্নে রাখব। আমি অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে পদক পেলেও সেগুলো আমার পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এটি স্বতন্ত্র। আবারও আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিজ্ঞান ভাবনা

প্রফেসর ড. এম শমশের আলী

মরহুম খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) ছিলেন এ যুগের এক অবিস্মরণীয় শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সুফি এবং সমাজ সংস্কারক। ২৭ শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ সালে সাতক্ষীরার নলতায় জন্মগ্রহণকারী এই ক্ষণজন্মা সুফি অবিভক্ত ভারতে ও পাকিস্তান আমলে শিক্ষাসহ যে কাজেই হাত দিয়েছেন সেখানেই রেখেছেন তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের স্বাক্ষর। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যাননি কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাংলার মানুষের প্রতি তার ছিল অশেষ ভালোবাসা। ইসলাম ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন বাংলায়। কোট প্যান্ট পরিহিত উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন মানবকল্যাণ বিষয়ক কর্মে ব্যাপৃত এই মানুষটির হৃদয় ছিল স্রষ্টার স্মরণে ও সৃষ্টির সেবায় বিভোর। তিনি ছিলেন স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত এক আলোকিত সুফি। এই সুফির অগণিত ভক্ত তাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার ভাবনা কি ছিল এ প্রসঙ্গে অনেক ভক্ত জানতে চান। এ নিয়ে কিছু বলার আগে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র। দর্শন মানে দেখা। ভালোভাবে দেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষকরা যখন বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে গিয়ে গবেষণা করেন এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করেন, তখন তাদেরকে প্রদান করা হয় পিএইচডি (PhD) ডিগ্রি। বহুকাল ধরে প্রচলিত এই শব্দটি (পিএইচডি) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সকল শাখায় প্রযোজ্য হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান বা ইলমকে দেখা হয় সামগ্রিকভাবে (একটি Holistic approach য়ে), খণ্ডিতভাবে নয়। বেশ কয়েক দশক আগে Harvard classification of knowledge এর পূর্বে জ্ঞানের এমন বিভক্তিকরণ ছিল না। ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি কবিতা লিখছেন, গণিতের গবেষণা করছেন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ করছেন, অন্যদিকে মহাকাশ গবেষণাও করছেন। উমর খইয়াম, আল খরেজমি, ইবনাল হাইসাম প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই Holistic approach য়ে মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা স্পেনে আটশ বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন, পরবর্তীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের উপর তার প্রভাব পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রখ্যাত আর্টিস্ট Leonardo da Vinci যার মোনালিসা নামক চিত্রকর্ম সারা পৃথিবীতে খ্যাত, তিনিও একদিকে চিত্রশিল্প ছাড়াও human anatomy তে পারদর্শী ছিলেন এবং আধুনিক হেলিকপ্টারের অনেক আগে হেলিকপ্টারের কার্যাবলি নিয়ে গবেষণা করেছেন।

এবার আমরা সুফি দার্শনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে বলব। এই বিরাট মহীয়সী ব্যক্তিটি গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা কিন্তু নয়। তার বিজ্ঞান ভাবনা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতি পাঠ বা সৃষ্টির দর্শন থেকে উদ্ভূত। ওই যে একটু আগে বললাম প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কথা, তা কিন্তু পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। ১০ নম্বর সূরার ১০১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাসূল (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "কুলইন-জুরু মা জা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল-আর্দ"। বাংলা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই "ওদেরকে বল আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতিটির উপর যেন নজর দেয়া হয়"। আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় জিনিসও আছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যে biggest of the big থেকে smallest of the small বস্তু নিয়ে গবেষণা করে, সে সবই এই আয়াতের আওতায় পড়ে। আর এই যে আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, সেটাই তো বিজ্ঞানের এজেন্ডা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্য (truths) গুলো ধরা পড়ে। এই সত্যের কথাই কোরআনে বার বার উল্লেখিত

প্রফেসর ড. এম শমশের আলী

কোট প্যান্ট পরিহিত উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন মানবকল্যাণ বিষয়ক কর্মে ব্যাপৃত এই মানুষটির হৃদয় ছিল স্রষ্টার স্মরণে ও সৃষ্টির সেবায় বিভোর। তিনি ছিলেন স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত এক আলোকিত সুফি।

হয়েছে। বলা হয়েছে কোরআন সত্যসহকারে নাজিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে রাসূল (সাঃ) কে সত্যসহকারে প্রেরণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে জগৎসমূহের সৃষ্টি সত্যসহকারে করা হয়েছে। এই সত্যই হচ্ছে কোরআনের প্রাণ। আর বিজ্ঞানের কাজ হলো এই সত্যকে আবিষ্কার করা। তাই বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের কোনো বিরোধ নেই, আছে সামঞ্জস্য (concordance)। এই অর্থে প্রকৃতি পাঠ সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিজ্ঞান ভাবনা এই প্রকৃতি পাঠ থেকেই উৎসারিত। প্রকৃতির মাঝে যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, প্রতিসাম্য ও প্রজ্ঞাপ্রসূত মহাপরিকল্পনা দেখা যায় তা সুফি ও দার্শনিক আহ্ছানউল্লার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি তাই মানুষকে প্রকৃতির নীরব লীলা খেলা দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তার এই ধারণা কোরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আজকে মাঠে-ময়দানে ওয়াজের মাধ্যমে আমরা কোরআনকে যেভাবে উপস্থাপন করি তা থেকে এখনকার তরুণ-তরুণীদের মনে একটা ধারণা হতে পারে যে, কোরআনে আল্লাহ পরকালের কথা, বেহেশত এবং দোজখের কথাই বেশি বলেছেন, জগতের কথা নয়, বিজ্ঞানের কথা নয়। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমরা বুঝতে পারি তখনই যখন কোরআনের প্রথম সূরা থেকে শুরু করে শেষ সূরা পর্যন্ত যে ৬৬৬৬ টি verse আছে তার প্রতিটির দিকে যদি নজর দিই। তখন দেখা যায় যে, কোরআনে জমিনের উর্ধ্বের কথা এবং জমিনের নিম্নের কথা যত না বলা হয়েছে তার চেয়ে বহু গুণে এবং বহু বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে জমিনের উপরের জিনিসের কথা, আকাশ পৃথিবী ও সমুদ্রের কথা, বায়ু চলাচলের কথা, নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টির কথা, মানব সৃষ্টির কথা, জীব-জন্তু ও বস্তুর সংগঠনের কথা। এই শেষোক্ত জিনিসিগুলো যা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে সেগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে কোরআনে 'আয়াত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ 'নিদর্শন'। বিজ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টি পাঠ সেই অর্থে আল্লাহর আয়াত। ইংরেজিতে বলতে গেলে Science is one of the Signs of Allah। আরও মজার কথা হলো এই যে, স্বর্গের সুখ এবং নরকের যন্ত্রণা এই সব কথা চিন্তা করে মানুষকে কিন্তু আল্লাহতাআলা-র উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়নি। বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলো দেখে। উদাহরণস্বরূপ কোরআনের ২১ নম্বর সূরার ৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আকাশ এবং পৃথিবী একসময় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং আমি তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছি ..... তবুও তারা ঈমান আনবে না।" এই আয়াতটি পড়লে বর্তমানে প্রচলিত Big Bang theory এর কথাই মনে হয়। তার চেয়েও মজার বিষয় হলো এর শেষের কথাগুলো "আফালা ইউনুনুন" অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কি এখনও ঈমান আনবে না? স্পষ্টতই আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পাঠ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয় বরং বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তার বিজ্ঞান ভাবনায় এই সৃষ্টির অবলোকন থেকেই স্রষ্টাকে জানার জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন। লিখেছেন 'সৃষ্টি তত্ত্ব' শীর্ষক একটি বই [১]। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪৯ সালে প্রথম যখন এই বইটি প্রকাশ হয় তখন পৃথিবীর জন্ম, বিবর্তনবাদ, সৌরজগৎ এবং এর গ্রহগুলোর সংখ্যা, মাধ্যাকর্ষণশক্তি সম্পর্কে যে তথ্য ছিল তা পরবর্তীতে কিছুটা বদলেছে এবং বিজ্ঞানের বলবিধিগুলো ও তাদের একত্রীকরণ, মৌলিক কণা (fundamental particle) সম্পর্কে নতুন তথ্য হালে সংযোজিত হয়েছে। সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে সৃষ্টির রহস্যের কথা (যা জানার জন্য বিজ্ঞানের এত বিরাট আয়োজন) বলতে গিয়ে সৃষ্টির মধ্যে যে intelligent design এর কথা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন তা সত্যই মনোমুগ্ধকর। পশ্চিম জগতের অনেক বিজ্ঞানী যেমন Galileo থেকে শুরু করে Newton, Max Planck, Maxwell এবং পরবর্তীতে অনেক আধুনিক বিজ্ঞানীও স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এই intelligent design এর কথাই বার বার অবতারণা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এই design argument এর একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তার রচিত 'সৃষ্টি তত্ত্ব' বইটিতে এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনি লিখছেন:

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিজ্ঞান ভাবনা এই প্রকৃতি পাঠ থেকেই উৎসারিত। প্রকৃতির মাঝে যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, প্রতিসাম্য ও প্রজ্ঞাপ্রসূত মহাপরিকল্পনা দেখা যায় তা সুফি ও দার্শনিক আহ্ছানউল্লার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে।

"পাঠক! কখনও কি সৃষ্টিকৌশল চিন্তা করিয়াছেন? এই যে বিরাট বিশ্ব দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার মূলে কি রহস্য নিহিত আছে? বিশ্ব কি স্বতঃই সৃষ্ট হইয়াছে, এই সৃষ্টির কি কোন উদ্দেশ্য নাই? একটু চিন্তা করলেই সারা বিশ্বে শৃঙ্খলা বা সুনিয়ন্ত্রণ দৃষ্টিগোচর হয়। ভূমন্ডলস্থ প্রত্যেক পদার্থ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট, আকাশমন্ডলস্থ প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ একই নিয়মে পরস্পর আবর্ত্তন করিতেছে, একই নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে শীত-গ্রীষ্ম আসিতেছে, একই সময়ে বর্ষার উৎপত্তি ও অবসান, একই নিয়মে দিবা-রাত্রির পরস্পর অনুসরণ, একই নিয়মে জোয়ার-ভাটার উৎপত্তি ও অবসান। আবার প্রত্যেক পদার্থের অণু-পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ উপলব্ধি হয় কেন? কেহ কি চিন্তা করিয়াছে? এই যে শতধা আকর্ষণ কোথা হইতে আসে? ইহার স্রষ্টা কে? সৃষ্টিরই বা কারণ কি?

সারা বিশ্বে সবুজ বর্ণ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়, ইহাদেরই-বা কারণ কি? ইহাদের উত্থান বা পতনের কি কোন রহস্য নাই? শষ্যাদির গাছ হয়, ফুল হয়, পরে স্বতঃই মরিয়া যায়। কেন, ইহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? বিল, খাল, নদ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত ইহাদের কি কোন উপকারিতা নাই?

একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের মধ্যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে। প্রত্যেক পদার্থ স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, সারা বিশ্ব একই নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একই উদ্দেশ্য সাধনহেতু- সে উদ্দেশ্য কি?"

এই লেখাটির মধ্যে নিউটনের একটি উক্তির অনুরণন পাওয়া যায়: "Whence ariseth this order?" নিউটন পদার্থের গতিবিধির নিয়মাবলি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের পরই বিশ্ব শৃঙ্খলার ব্যাপারে এমন পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুফি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তো বিজ্ঞানী ছিলেন না, তার মনেও একই ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হলো কেমন করে? এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে যে সত্যে উপনীত হন, সুফিরা অনেক সময় 'কাশফ' এর মাধ্যমে সেই একই সত্যে পৌঁছে যান। হযরত আলী (রা.), শেখ সাদী, হাতিফ ইসপাহানী প্রমুখ সুফি জ্ঞানসাধকদের কাছ থেকে এমন উদাহরণ পাওয়া গেছে। এগুলো আলোচনা করা সময়সাপেক্ষ বিধায় এই বিষয়টির বিস্তারিত পর্যালোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বইয়ের লেখা থেকে এ কথা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে উনি যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি শুধু পর্যবেক্ষণ করেছেন তা নয়-এর পেছনে সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেম, সৃষ্টির ভারসাম্য ও জীবকুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্রষ্টার যে পরিকল্পনা তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটিরই বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞানী না হলেও তার বিজ্ঞান ভাবনা ছিল অত্যন্ত সুগভীর। সৃষ্টিকে দেখে তিনি স্রষ্টাকে বোঝার প্রয়াস পেয়েছেন। এটাই তার বিজ্ঞান ভাবনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। সুফি হিসেবে তিনি যে চিন্তা করেছেন সে চিন্তা কিন্তু হালের অনেক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদও করে চলেছেন। সম্প্রতি Oxford University এর গণিতের অধ্যাপক Professor Dr. John C. Lennox, GOD's Undertaker (Has Science Buried GOD?) [২] শীর্ষক তার লিখিত বইতে তিনি Apostle Paul এর একটি উক্তি করেছেন যা অনেক বিজ্ঞানীই করে থাকেন, সেটি হলো : 'Nature itself is part of the evidence for the existence of God'। যার অর্থ হলো "প্রকৃতি নিজেই স্রষ্টার একটি স্বাক্ষর বহন করে"।

জীব ও জড়ের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিজ্ঞান ভাবনার মধ্যে যে উদ্দেশ্যর কথা বলা হয়েছে তা 'The Anthropic Cosmological Principle' এর সমার্থক। মাত্র কয়েক দশক আগে John D. Barrow এবং Frank J. Tipler এই নামে একটি বই লিখেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সৃষ্টি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এই বইটিতে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরোক্ত Principle টির মূল কথা হলো এই যে, সৃষ্টিতে নিয়ম-কানুন (laws of nature) ও ধ্রুবক (constants of nature যথা Planck's constant, gravitational constant, velocity of light ইত্যাদি) যদি একটু এদিক ওদিক হতো তাহলে তো আমরা বাঁচতে পারতাম না। অর্থাৎ স্রষ্টা যেন সম্ভাব্য অনেক Universe থেকে একটি মাত্র Universe আমাদের জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করেছেন। এই প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) দুঃখ করে লিখেছেন 'মানব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন। একটি মিনিটও দুনিয়াবি চিন্তা হইতে নিজেকে বিরত করিয়া দয়াময়ের রহমতের চিন্তা করিতে চায় না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে'।

পরিশেষে এ কথাই বলা চলে যে সুফি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বিজ্ঞান ভাবনা যেন আমাদের মনকে সৃষ্টির বিন্যাস দেখে স্রষ্টার দিকে ধাবিত করে। সৃষ্টির সৌন্দর্য ও কলাকৌশল দেখে আমরা যেন স্রষ্টার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়তে পারি ও তাঁর গুণকীর্তন করতে পারি। তাঁর সৃষ্টির সেবা করে ধন্য হতে পারি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞানী না হলেও তার বিজ্ঞান ভাবনা ছিল অত্যন্ত সুগভীর। সৃষ্টিকে দেখে তিনি স্রষ্টাকে বোঝার প্রয়াস পেয়েছেন। এটাই তার বিজ্ঞান ভাবনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সৃষ্টিতত্ত্ব- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.), প্রকাশক এবং সম্পাদক- আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ISBN: ৯৮৪-৮৩৫৯-০৫-২ , পঞ্চম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১৫
2. GOD's Undertaker- John C. Lennox, Published by Lion Books an imprint of Lion Hudson plc, England, UK ISBN: 978-0-7459-5371-7 (print).
3. The Anthropic Cosmological Principle (series:Oxford Paperbacks), John D. Barrow & Frank J. Tipler, Publisher: Oxford University Press; Revised ed. edition (August 25, 1988), ISBN-13: 978-0192821478

লেখক: *প্রফেসর এমেরিটাস, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাদর্শন

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

'ইসলামের ইতিবৃত্ত কতকগুলি ঘটনা বা সন তারিখের তালিকা নহে। ইসলামের ইতিবৃত্ত মানবজাতির মুক্তি সাধনার ইতিবৃত্ত। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্তের মধ্যে তাহার জাতীয় জীবন, শিক্ষা-সভ্যতা, সুখ-দুঃখ ও গৌরবের প্রকৃত পরিচয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিহিত। সুতরাং ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নকালে এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে।'

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

তিনি লিখেছেন– 'বালক-বালিকার হৃদয়েই সু ও কু-র বীজ নিহিত থাকে। গুরুজন যত্নপূর্বক সুপ্রবৃত্তিগুলির আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিগুলির অনাচরণ দ্বারা একের পুষ্টি ও উৎকর্ষ এবং অপরের দমন সাধন করিবেন। ইহা এক দিনের কার্য্য নহে। ইহা বড় কঠিন যোগ।'

শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাভাবনা ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং সেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। তিনি মনে করতেন, সমাজে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকবে অবারিত। এই সমাজে একজন মানুষ হবে বিচক্ষণ, বিবেক বুদ্ধিচালিত এবং গঠিত হবে তার নৈতিক চরিত্র। সাধারণ নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সাধারণের ধারণায় থাকবে প্রেম, ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শ। মানুষের সব মূল্যবোধ বিবেচিত হবে আদর্শের মানদণ্ডে। এ সমাজের মানুষের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালি হবে নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত, কুসংস্কারমুক্ত এবং কুপ্রথামুক্ত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। সমাজে মানুষ হবে দেশপ্রেমিক। আন্তর্জাতিক গতিশীলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সবাই হবে সজাগ ও সচেষ্ট। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অংশ নেবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকবে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তার মতে 'মনুষ্যত্ব লাভ'। আর মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক– এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মায় প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষকে সম্ভব মানবসম্পদে পরিণত করা। শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব একজন মানুষের মধ্যে আত্মোপলব্ধি জন্মানো, আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়ী একজন মানুষ করে গড়ে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন– 'জ্ঞান লিপ্সাকে বর্ধিত করিয়া মানসিক শক্তিকে পরিচালনা করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।'

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে, 'শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের ক্রিয়াশীলতা জন্মায়, মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়; যাতে জ্ঞান অন্বেষণ ও সুপ্ত শক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে, প্রত্যেকের আত্মবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়। তিনি মনে করেন, 'পরীক্ষায় কৃতকার্যতা কোন শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। প্রকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা শিক্ষা দিলে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ের পূর্ণতা লাভ হইতে পারে।'

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাচেতনা সন্নিবেশিত হয়েছে তার 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান' প্রবন্ধ পুস্তক (১৯১৮), 'টিচার্স ম্যানুয়েল' (১৯১৫), 'Calcutta University Commission Report-1917-19', পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে তার দেওয়া পরামর্শ (১৯৫০) এবং কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে।

সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ বিষয়গুলো, যেমন– ভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তার ছিল অভিন্ন অভিমত। প্রতিটি বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠদান পদ্ধতি সবই লক্ষ্যমুখীকরণের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি বিষয় নির্বাচনে থাকবে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য।

নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মনে করতেন, চরিত্রই মানবের সর্বপ্রধান সম্পদ। একজন মানবের জন্য প্রয়োজন নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র গঠন। তার জন্য শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার। তাই প্রয়োজন নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানবের চরিত্র গঠন করা। পাশাপাশি থাকবে বাস্তব জীবনের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি তত্ত্বগত শিক্ষার ব্যবস্থা। একই সঙ্গে অর্জিত হবে ন্যায়ানুষ্ঠানের অভ্যাস। তিনি লিখেছেন– 'বালক-বালিকার হৃদয়েই সু ও কু-র বীজ নিহিত থাকে। গুরুজন যত্নপূর্বক সুপ্রবৃত্তিগুলির আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিগুলির অনাচরণ দ্বারা একের পুষ্টি ও উৎকর্ষ এবং অপরের দমন সাধন করিবেন। ইহা এক দিনের কার্য্য নহে। ইহা বড় কঠিন যোগ।' ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ্যসূচির মধ্যে জীবন গঠনমূলক নীতি ও উপদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে এই শিক্ষা বাস্তবায়ন 'শিক্ষকের যোগ্যতা, তাহার ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।' 'মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে আগত, পরমাত্মার সহিত পুনঃমিলনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।' অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ চরিত্র গঠন। আর এই চরিত্র গঠনের জন্য নীতি শিক্ষা অপরিহার্য। তাই ধর্ম নির্বিশেষে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক করা ও নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'মানব প্রেম–সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে সৃষ্টের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস আসিলে পাপের ভীতি ও পুণ্যের আকর্ষণ জন্মে। উহার ফলে ধর্মের অনুরাগ ও চরিত্র গঠিত হয়। শিক্ষক ধর্মপরায়ণ হইলে তাহার প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সুফলপ্রসূ হয়।'

ধর্মকে শিক্ষার ভিত হিসেবে বিবেচনায় তার মতে– শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মলোচনা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাত্রদের মনেপ্রাণে খোদার প্রতি এবং সমগ্র মানবতার প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে। বিদ্যালয় থেকে ইসলামের নীতিসমূহ জানাতে হবে। প্রত্যেকেই সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ (useful) সদস্যে পরিণত হতে সক্ষম হবে। তারা সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বদা থাকবে সচেষ্ট। একজন মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভের জন্য নৈতিক চরিত্র গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে এই নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক স্কুলে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি থাকবে নামাজ বাধ্যতামূলক। খোদাবিহীন শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা পাশাপাশি চলবে। তিনি লিখেছেন– 'সমগ্র মানব সমাজে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মহান দায়িত্ব নিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত।' মিশন প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের আদর্শ প্রচার ও প্রসার হচ্ছে আহ্ছানিয়া মিশন ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের মাধ্যমে।

একটি মানবশিশু জন্মের পর সে কাঙ্ক্ষিত সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠার জন্য শরীর, মন ও আত্মা– এই ত্রিবিধ শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। আর সেই শিক্ষার জন্য শিক্ষাস্থল হবে মূলত ১. গৃহ, ২. বিদ্যালয়, ৩. ধর্মশালা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'গৃহ হল শিক্ষার ভিত্তিস্থান। কেবল গৃহে শিক্ষার পরিপক্কতা জন্মিতে পারে না বলিয়াই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা, একটি অপরটির পরিপূরক।' 'গৃহ-শিক্ষার উপর চরিত্র-গঠন অনেকাংশে নির্ভর করে। মাতাপিতার প্রভাবে পুত্র-কন্যার চরিত্র যেরূপ সহজে গঠিত হয়, অপরের প্রভাবে তদ্রূপ হয় না।' গৃহ থেকেই মানুষের মূল্যবোধ তৈরি হয়। যার আলোকে গড়ে ওঠে বিবেক; গড়ে ওঠে তার চেতনা; গড়ে ওঠে তার শক্তি। তদুপরি গৃহে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। একজন মানুষের মানবীয় সত্তার বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে বহুমুখী, যাতে ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের সহায়ক হয়। আবার নানামুখী প্রতিভা সম্পর্কিত মানুষের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। বিদ্যালয় হবে মানুষ তৈরির কারখানা। মানুষ তৈরির জন্য সব আয়োজনের সমন্বয় ঘটবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে আদর্শ নকশা অনুযায়ী। শিক্ষা উপযোগী আসবাবপত্র ও উপকরণাদির সুব্যবস্থা থাকবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও বিকাশের জন্য থাকবে সংগঠিত লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম। ছাত্রনিবাস চলবে সুনির্দিষ্ট নিয়মে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষের মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটাবে। পৃথিবীতে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে 'মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব, পরীক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলা নয়।'

শিক্ষার জন্য সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে তিনি মনে করেন– সমাজ যত উন্নত হবে, শিক্ষার জন্য তত অনুকূল হবে। শিক্ষার সঙ্গে বাহ্য সমাজের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। কারণ শিক্ষাবহুল দেশে খুব দ্রুত মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটে। তাই সমাজের অবস্থাকে একবার কাম্য স্তরে পৌঁছাতে পারলে সমাজ নিজেই সহায়তা করবে শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে।

লেখক: *সরকারের সাবেক সচিব; এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান*

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে, শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে, যাতে মানুষের ক্রিয়াশীলতা জন্মায়, মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট হয়; যাতে জ্ঞান অন্বেষণ ও সুপ্ত শক্তি বিকাশের ধারা সূচিত হয়, জ্ঞানলিপ্সাকে বর্ধিত করে, প্রত্যেকের আত্মবলম্বন শক্তি পূর্ণভাবে প্রদীপ্ত হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানবতার সেবায় আদর্শ প্রতিষ্ঠান

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য

অর্থনীতি, শিক্ষাসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে ২০১৬ সালের খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ২ ডিসেম্বর শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এমএইচ খান মিলনায়তনে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তার হাতে এ পদক তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী ড. আনিসুজ্জামান। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য। তার বক্তব্য পত্রস্থ হলো।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য

আমরা অত্যন্ত গর্বিত, বাংলাদেশে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সম্প্রতি যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করেছি, যেখানে বাংলাদেশের একটি মানুষও পেছনে পড়ে থাকবে না, সে উদ্যোগের সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যুক্ত হয়েছে।

আমি আজ এখানে দাঁড়িয়েছি অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিয়ে। কারণ আজকের এ অনুষ্ঠানের আয়োজক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এটি বাংলাদেশের শুধু একটি কৃতী প্রতিষ্ঠান বললে ভুল হবে; আমি বলি, বাংলাদেশে মানবতার সেবায় যে কয়টি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোর পুরোধা হিসেবে অত্যন্ত আদর্শ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের সবার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। আমি আপনাদের সবাইকে এজন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। আহ্ছানিয়া মিশনের এ সফলতার পেছনে কাজী রফিকুল আলম সাহেবের যে অবদান, সেটির প্রতি আমি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানাতে চাই।

আমরা অত্যন্ত গর্বিত, বাংলাদেশে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সম্প্রতি যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করেছি, যেখানে বাংলাদেশের একটি মানুষও পেছনে পড়ে থাকবে না, সে উদ্যোগের সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যুক্ত হয়েছে। সেজন্য আমরা খুবই গর্ববোধ করি।

আজকে যার নামে এ সম্মানসূচক পদক দেয়া হচ্ছে, তার ব্যাপারে ড. আবদুল মজিদের কাছে আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন। আমি এখন যেটি বলতে পারি, সেটি হলো– শত বছর আগে আমাদের এ অঞ্চলে এরকম একজন আলোচিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার সুফল আজ আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে যাচ্ছি। এটি আমাদের জন্য একটি বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এমন একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি শিক্ষাকে শুধু শিক্ষা হিসেবে দেখেননি, শিক্ষার প্রচারকে তিনি সমাজ পরিবর্তন, সমাজ সংস্কার এবং তৎকালীন অসুবিধাগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করতে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন। এরকম একজন মানুষের নামের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পেরেছি– এটি আমাদের বিরল সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। তিনি ছিলেন গবেষক, তিনি ছিলেন সুফি সাধক। তিনি এমন একজন আলোকিত মানুষ ছিলেন, যিনি ধর্ম চর্চা করেছেন; কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে। এ আলোকিত আধ্যাত্মিক চিন্তাও আজকালকার সমাজে খুব বিরল একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

সেহেতু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে যদি স্মরণ করতে হয়, তার প্রতি যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হয়, তাহলে একদিকে যেমন আমাদের সমাজসেবা, মানবসেবার বিষয়টিকে মনে রাখতে হবে, অপরদিকে আমাদের ধর্মীয় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক চেতনার ভেতরে অসাম্প্রদায়িক ধারণাকে ধারণ করতে হবে। এ দুইয়ের সম্মিলনের মধ্য দিয়েই আহ্ছানিয়া মিশন আগামী দিনে এগিয়ে যাবে– এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনাদের সবাইকেই সেজন্য অভিনন্দন।

আজকের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেব এসেছেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আপনাদের সবার শ্রদ্ধেয় তো বটেই, তিনি আমারও শ্রদ্ধাভাজন। তিনি আমার এগারো ভাগের এক ভাগের নিয়োগকর্তাও বটে। কারণ সিপিডির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ থেকে আমার চাকরির অনুমোদন হয়, তিনি সেটির একজন সদস্য। সেহেতু আজকের সভাপতি, সিপিডির চেয়ারম্যান এবং আজকের প্রধান অতিথি আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

গতকাল পোপকে নিয়ে আয়োজিত নাগরিক ও আন্তঃধর্মীয় সভায় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বক্তব্য রেখেছিলেন। আমি আজ এখানে এসেই আনিস স্যারকে বলেছি, আপনার একটি কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা সবাই গতকাল ঘরে ফিরেছি। তিনি বলেছেন, এখনও বাংলাদেশের কোনো কোনো জায়গায় ধর্মীয় বৈষম্য বা জাতিগত নিপীড়নের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের ওপর বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার হয়। স্যার 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করে 'নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী' ব্যবহার করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, অন্য কোনো ভালো শব্দ না পেয়ে আমি সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করছি। আসলে সংখ্যালঘু তারা, যারা অত্যাচার করে; যারা অত্যাচারিত হয়, তারা সংখ্যালঘু নয়। খুব অল্পসংখ্যক মানুষই আমাদের এ সমাজে অত্যাচারের ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্ষমতা, বৈভব ও নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে এ কাজগুলো করে থাকে। আমি এখানে প্রবেশ করেই স্যারকে সেজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম যে, গতকাল আপনি 'সংখ্যালঘু'র নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

আজ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে নিয়ে আলোচনা করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। একজন শিষ্যের জন্য জনসম্মুখে গুরু সম্পর্কে বলা অত্যন্ত বিরল সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। এ কারণে এ সুযোগ দেয়ার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তবে সভাপতি আমাকে সময়মতো থামাবেন, কারণ আমি বলতে চাইলে তার ওপর প্রচুর ও বহু সময় ধরে বলতে পারব, তাতে হয়তো আজকের অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটবে।

সংক্ষেপে বলছি, অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করার বহু দিক রয়েছে। একটি বিষয়ে আপনারা চিন্তা করতে পারেন, তিনি অত্যন্ত উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্গীয় পরিবার থেকে এসেছিলেন। যেমন আপনারা জানেন, তার মা ও পূর্বপুরুষরা ঢাকার নবাব পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। তার বাবা সে অর্থে উন্মেষকালীন বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন। সে সময় তিনি চামড়ার ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সে রকম একজন মানুষ কীভাবে জ্ঞানচর্চার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এসে সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়ান!

সামাজিক চিন্তার যে বিবর্তন এবং এর ফলে যে সামাজিক অবস্থান, সেটি একধরনের গবেষণার বিষয় হতে পারে, আলোচনার বিষয় হতে পারে। আমরা অনেকেই যারা বামপন্থী আন্দোলন করেছি, তারা 'Declass Theory' বলি যে, নিজের শ্রেণী থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক বেশি অসহায় শ্রেণীর পক্ষে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা। সেটির হয়তো এক ধরনের প্রতিফলন আপনারা দেখতে পাবেন।

আবার আমরা অনেক ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারি, প্রফেসর রেহমান সোবহানের জীবন বাংলাদেশের ইতিহাসে কীভাবে সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে পাকিস্তানের প্রাদেশিক নিপীড়ন-নির্যাতন বা জাতিগত বৈষম্যের মধ্যে কীভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিচ্ছেন; অন্যদিকে পাকিস্তানোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেশ গড়ার কাজে ঢুকছেন। এটি আরেক ধরনের বিষয়। তারপর আপনি দেখতে পাবেন, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে কীভাবে গণতন্ত্রহীনতার মধ্যে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবস্থান নিচ্ছেন– এটি আরেক ধরনের। সেখানে এসেও পাশাপাশি আপনারা যখন অধ্যাপক সোবহানকে দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন, তিনি একজন বিশ্বনাগরিক– আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেটি পেট্রো ডলারেই হোক বা বৈদেশিক সাহায্যে। বাংলাদেশের স্বাধীন স্বকীয় চিন্তা এবং বাংলাদেশে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদির সঙ্গে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হওয়া। এখানে আরেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে বিচার করতে পারবেন।

আরও বিচার করতে পারবেন, এ অঞ্চলের অর্থাৎ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে কেমন করে একটি অখণ্ড আঞ্চলিক সত্তা ও অখণ্ড আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা যায়। সেটি হলো আরেক ধরনের। সে চিন্তা শুধু অঞ্চলের ভেতরেই থেমে থাকে না, নতুন বিকাশমান অর্থনীতি যেমন– চীন এবং আরও দূরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে এটির সঙ্গে যুক্ত করা। সেটি হলো বিকাশের আরেকটি চিন্তা। অর্থাৎ তিনি ৮২ বছর বয়সের এমন একজন তরুণ মানুষ, প্রতিনিয়ত আপনারা লক্ষ করবেন যে,

আজ অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে নিয়ে আলোচনা করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। একজন শিষ্যের জন্য জনসম্মুখে গুরু সম্পর্কে বলা অত্যন্ত বিরল সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয়। এ কারণে এ সুযোগ দেয়ার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

তাৎক্ষণিকতার প্রতি যেমন তিনি প্রতিক্রিয়া দেখান, একই রকম ঐতিহ্যের প্রতিও অনুগত থেকে সেটিকে ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যান।

আপনাদের কাছে যেটি বলতে চাই সেটি হলো, অধ্যাপক সোবহানকে দেখতে চাইলে পারিবারিক জীবন থেকে, তার উত্তরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সঠিকভাবে দেখতে পাবেন। তার শিক্ষা, গবেষণা, জাতীয় অবদান থেকেও তাকে দেখতে পাবেন। একজন নাগরিক সমাজের নেতা হিসেবে দেখতে পাবেন, আবার একজন বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে, আঞ্চলিক নাগরিক হিসেবেও তাকে দেখতে পাবেন।

অধ্যাপক সোবহানের কাছ থেকে আমরা কী শিখেছি, তার খুবই অকিঞ্চিৎকর উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু বলেই শেষ করব।

একটি বড় জিনিস শিখেছি। আমরা তার কাছ থেকে শিখেছি, সেটি হলো, জ্ঞানের জন্য জ্ঞান নয়; জ্ঞান হলো পরিবর্তনের জন্য। এ জ্ঞান দিয়ে যদি আমি দেশের মানুষের পরিবর্তন না করতে পারি, জীবনের পরিবর্তন না করতে পারি, দেশের ভবিষ্যতের পরিবর্তন না করতে পারি, একটি উন্নততর বিশ্বের একটি অঞ্চল যদি না গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এ জ্ঞান দিয়ে কী হবে? জ্ঞান তো শুধু জ্ঞানের জন্য নয়, জ্ঞান হলো পরিবর্তনের জন্য। Knowledge is not for knowledge sake; knowledge is for change. আর সে পরিবর্তনটি কার জন্য হবে? সে পরিবর্তনটি হবে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটি, সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষটি, সবচেয়ে বৈষম্যের শিকার মানুষটি, সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষটির জন্য।

এ জ্ঞান দিয়ে যদি আমি দেশের মানুষের পরিবর্তন না করতে পারি, জীবনের পরিবর্তন না করতে পারি, দেশের ভবিষ্যতের পরিবর্তন না করতে পারি, একটি উন্নততর বিশ্বের একটি অঞ্চল যদি না গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এ জ্ঞান দিয়ে কী হবে?

প্রফেসর রেহমান সোবহান নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের কথা বলছেন, ধর্মীয় নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুর কথা বলেছেন, খেটে খাওয়া গরিব মানুষ ও পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কথা বলেছেন। একইভাবে তিনি কৃষি খামারে খেটে খাওয়া শ্রমিক-মজুরের কথাও বলেছেন, প্রভু-দাসের শ্রমিকের কথাও তিনি বলেছেন। তার এ জ্ঞানকে নিতে হবে। প্রফেসর রেহমান সোবহানের অকিঞ্চিৎকর উত্তরাধিকার হিসেবে এটি আমরা তার কাছ থেকে শিখেছি। তার কাছ থেকে আরও শিখেছি, পেশা জীবনের নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধের সমন্বয় না থাকলে পেশা জীবনের নিষ্ঠা যথোপযুক্ত হয় না।

প্রফেসর রেহমান সোবহানের জীবনে আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের জন্য তার মমত্ববোধ, সহমর্মিতা ও তাদের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। এটি তাকে শীতের দিনে রাতের অন্ধকারে গরিব মানুষকে কম্বল বিলাতে নিয়ে যায় নিভৃতে নির্জনে কোনো প্রচার ব্যতিরেকে। নিজের কাজের মানুষ থেকে শুরু করে সবার প্রতি তার মমত্ব তার কাছ থেকে আমরা নতুনভাবে শিখেছি।

পেশা জীবনে এ শিক্ষা, ব্যক্তি জীবনে তার মূল্যবোধ– এগুলো একত্র করে তাকে একজন অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম, বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো তাই বহু বহু বছর ধরে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, তার প্রতি আমরা অনুগত থাকব এবং আজকে আপনারা যে তাকে সম্মান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর চেয়ে বড় সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার একমত না হওয়ার কিছুই নেই।

আজ উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন

মো. আনিসুল কবির জাসির

তরুণ সমাজকে, বিশেষত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং নতুন প্রজন্মের পেশাদারদের মাঝে নৈতিকতা, মানবতা, সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবনে সহযোগিতা করার প্রয়াসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন **(ডাম)** এবং নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি **(নাবিক)**-এর যৌথ উদ্যোগে "সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (Center for Ethics Education [CEE]) এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে **'নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র'**।

''স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা" এই মহান ব্রত নিয়ে প্রায় ৬০ বছর আগে ডাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) যা আজও সমাজে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, কল্যাণ, মর্যাদা, অধিকার আর রোগ ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে কাজ করে চলেছে। সিইই এই প্রতিষ্ঠানের একটি নবতর সংযোজন।

সিইই-এর প্রধান লক্ষ্য হলো- সামাজিক, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে সেই সব জনগোষ্ঠী তথা স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যারা আগামীতে জাতির কর্ণধার হবেন। বর্তমানে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী এক বছরের জন্য একটি নৈতিক শিক্ষাক্রম এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ তৈরির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কোর্সটি মূলত সপ্তাহে দেড় ঘণ্টার একটি ক্লাস বা সেশন আকারে বছরে ২২টি ক্লাস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। শিক্ষাক্রম এবং উপকরণ কী হবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য গত নভেম্বরে (২০১৭) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজের নানা পেশার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সম্ভাব্য পাঠ্যসূচি কী হবে তা ঠিক করা হয়েছে। ২০১৭-এর নভেম্বরের সভায় যে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হলো- শিক্ষা ও নৈতিকতা, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নৈতিকতা, আইন ও নৈতিকতা, প্রকৃতি ও পরিবেশ, ধর্ম ও নৈতিকতা, ব্যবসায় ও নৈতিকতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও নৈতিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্রতাসহ দৈনন্দিন জীবনে করণীয়সমূহ প্রভৃতি।

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জানুয়ারি ১৩, ২০১৮ দিনটি ছিল কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের দিন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের আগে অর্থাৎ গত অক্টোবর ২০১৭ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয় আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। উদ্বোধনী দিনের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও অনৈতিক বিষয়ে ধারণা ও করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় ঢাকার আহছানিয়া মিশন কলেজ, ইম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নবারুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নলেজ আইডিয়াল হাইস্কুল, সিসিইআর মডেল কলেজ, প্রথম আলো মডেল হাই স্কুল, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্বদ্যিালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় নব্বই জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে ঢাকা শহরের ১০টি স্কুল, পাঁচটি কলেজ এবং পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শিক্ষা কোর্সটি শুরুর পরিকল্পনা নিয়ে সিইই টিম কাজ করে চলেছে।

লেখক: *প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন*

সিইই-এর প্রধান লক্ষ্য হলো- সামাজিক, ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যারা আগামীতে জাতির কর্ণধার হবেন।

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা নিয়মিত প্রকাশনার ৪০ বছর

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের যাত্রা সংকট আর সম্ভাবনা নিয়েই। পাকিস্তানের প্রায় দুই দশক আর বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ দশক গণমাধ্যমকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি মালিকানা আর হালের করপোরেট মালিকানা-পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন নেই। বিভিন্ন সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একটি বড় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও একই সমস্যা নিয়েই এগিয়ে চলছে। শুরুর দিকের পথটাতো ছিল কুসুমাস্তীর্ণ। সেই চল্লিশ বছর আগে। নিজেদের নানা কাজের বিবরণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকাশনার কথা ভাবা হয়েছিল। এটি হবে প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। আলোচনা হয়েছে। সভা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরও প্রথম সংখ্যা বের করতে সময় লেগেছে ১১ বছর!

১৯৬৬ সালের ৫ জুনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় ‘আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা’ প্রকাশের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু মূল কাজ এগোয় না। শুরুতে আর্থিক সংকটটাই ছিল প্রধান। কেটে যায় ১২ বছর। এবার ১০৮তম কর্মপরিষদের সভায় (৩ এপ্রিল ১৯৭৭) সিদ্ধান্ত হয় যেভাবেই হোক ‘আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা’ প্রকাশ করতেই হবে। মিশন তহবিল থেকে ৫০০ টাকা আর ঋণ হিসেবে মিশনের পাবলিকেশন ট্রাস্ট থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু হয় মুখপত্রটির। প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯৭৭ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে।

নিউজপ্রিন্ট কাগজে ট্যাবলয়েড সাইজে পত্রিকাটি আলোর মুখ দেখে। এখন ম্যাগাজিন সাইজে আর্ট পেপারে চাররঙা প্রচ্ছদের মনোরম প্রকাশনা। ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে ৪০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ প্রকাশনার প্রধান আকর্ষণ এখন প্রচ্ছদ কাহিনি। শুরুতে পুরো পত্রিকা মিশনের কর্মসূচির বাইরে জাতীয় ইস্যুগুলোকেও স্থান দিয়েছে। যেমন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের সংখ্যায় প্রচ্ছদের বিষয় ১৯৯৫-সহিষ্ণুতা বর্ষ। সূচিতে আরো আছে নানা ধরনের নিবন্ধ আদর্শ ব্যবস্থাপক ও উন্নয়ন, ১৯৯৪ সালে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, রোগের নাম হিমোফিলিয়া, পরিবেশ সম্পদ কেন্দ্র ইত্যাদি। মিশন সংবাদ এসেছে ৭ পৃষ্ঠা। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। প্রচ্ছদে বিষয় থাকলেও ভেতরে ঠিক প্রচ্ছদ কাহিনি বলে কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও একই অবস্থা। যেমন পরিবেশ দিবস সংখ্যা, জাতিসংঘের ৫০ বছর, মিশনের কর্মধারার অগ্রগতি।

কেটে যায় ১২ বছর। এবার ১০৮তম কর্মপরিষদের সভায় (৩ এপ্রিল ১৯৭৭) সিদ্ধান্ত হয় যেভাবেই হোক ‘আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা’ প্রকাশ করতেই হবে। মিশন তহবিল থেকে ৫০০ টাকা আর ঋণ হিসেবে মিশনের পাবলিকেশন ট্রাস্ট থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু হয় মুখপত্রটির।

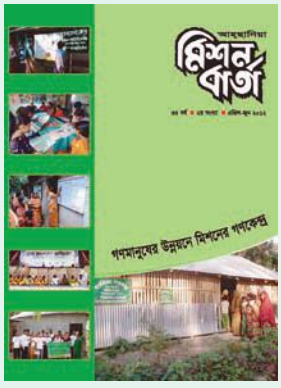

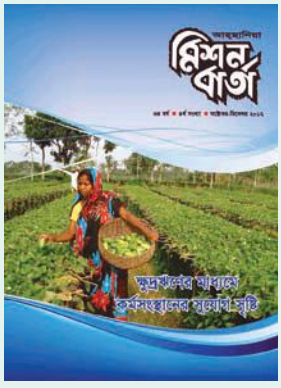

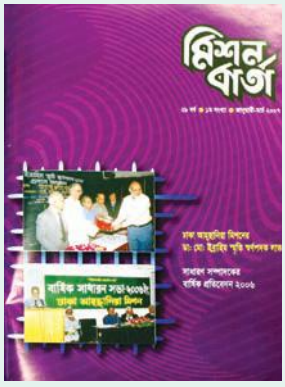

১৯৯৮'র শুরুতে পত্রিকার প্রচ্ছদ ডিজাইনে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রঙ বাছাইসহ ডিজাইন বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভেতরের নিউজপ্রিন্ট পৃষ্ঠার পরিবর্তে হোয়াইট প্রিন্ট পাওয়া গেল। পত্রিকাটি বেশ ঝকঝকে রূপ ধারণ করে। লেখাগুলোকেও বিভিন্ন বিভাগে আলাদা করা হয়–ফিচার, স্বাস্থ্য, প্রবন্ধ, ক্যাম্পাস, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদি।

মূলত নতুন শতকে পত্রিকার অবয়বে আরো পরিবর্তন আসে যুক্ত হয়েছে প্রচ্ছদ কাহিনি। অর্থাৎ একটি প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় বিষয়টিকে। যেমন কৃষি উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬), কারিগরি শিক্ষা প্রসারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (এপ্রিল-জুন ২০১৬), শিক্ষায় মিশনের উদ্ভাবনী মডেল (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬), ছিন্নমূল শিশুর বাসযোগ্য পৃথিবী (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫), মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫), মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে (এপ্রিল-জুন ২০১৭),

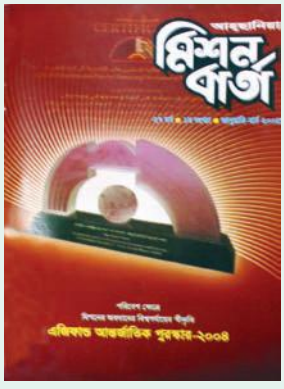

৩৫তম বছরের প্রথম সংখ্যায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পাবলিকেশন কনসালট্যান্ট আ. শ. ম. বাবর আলী লিখেছিলেন, "এইতো 'আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা'র বর্তমান অবস্থান ও পরিচিতি। নিঃসম্বলতায় যার প্রথম বর্ষ শুরু, অনেক সাধনার পথ পাড়ি দিয়ে পরম সমৃদ্ধতায় এর পঁয়ত্রিশে উত্তরণ। একটি সংগঠন, সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র যেমন হওয়া উচিত, হতে পারে তার পরিপূর্ণ বিকশিত সৌষ্ঠবে সমৃদ্ধ, যেমন পঁয়ত্রিশের 'আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা'।" (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩)

দীর্ঘ এ পথযাত্রায় মিশনের সবার আন্তরিকতা, শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা আর আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের একনিষ্ঠতা এ প্রকাশনার মান বাড়িয়েছে উত্তরোত্তর। সংকট ও সমস্যা হয়তো এখনও আছে, কিন্তু সেটাই বাস্তবতা। সংকট ও সমস্যা কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ মসৃণ করে নেবেন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক আর কর্মীরা। এ বিশ্বাস সকলের।

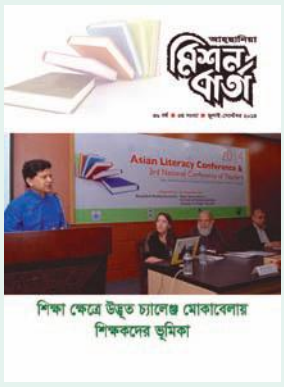

১৯৯৮'র শুরুতে পত্রিকার প্রচ্ছদ ডিজাইনে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রঙ বাছাইসহ ডিজাইন বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ভেতরের নিউজপ্রিন্ট পৃষ্ঠার পরিবর্তে হোয়াইট প্রিন্ট পাওয়া গেল। পত্রিকাটি বেশ ঝকঝকে রূপ ধারণ করে।

কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি এখনও দৃশ্যমান কাজী রফিকুল আলমের চোখে। ১৯৬১ সাল। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। বয়স ১৩ বছর। পড়ছেন যশোর জেলা স্কুলে। বাবা জেলা পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। বাসা স্কুলের কাছে। প্রতিদিনের মতো দুপুরে বাসায় খেতে এসে একদিন দেখলেন বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় মাটিতে বসা আর খাটের ওপর শ্মশ্রুমন্ডিত নূরানি চেহারার এক বৃদ্ধ, আসলে সেই সময় তিনি বায়াত দিচ্ছিলেন। এই বৃদ্ধ আর কেউ নন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখ পড়ল মায়ের ওপর। তিনি মাটিতে বসা ছিলেন। ছেলেকে দেখেই হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে বললেন 'তুমি বায়াত নাও'। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সাধারণত কাউকে প্রথমেই বায়াত দিতেন না। বলতেন 'চিন্তা করে আসো, চিন্তা কর তারপর বায়াত নিও'। কিন্তু কাজী পরিবারের ওপর তার আস্থা ও সন্তুষ্টি এতটাই গভীর ছিল যে, তিনি একবারেই এই পরিবারের সদস্যদের বায়াত দিয়েছেন। এই ঘটনাটিকে কাজী রফিকুল আলমের কাছে একটি অলৌকিক ঘটনা মনে হয়। এ ঘটনা তার জীবনে বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করে। স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, "মানুষের জীবনে বড় হতে হলে কিছু আদর্শ থাকা দরকার, যে আদর্শ মানুষ অনুসরণ করবে, সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। সেই আদর্শ শিক্ষক হিসেবে আমি পেয়েছিলাম হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) কে। তার সে আদর্শ ছিল সুদূরপ্রসারী, যে আদর্শ এখন পর্যন্ত আমার জীবনকে লালন পালন করছে, আমায় পথ দেখাচ্ছে, সূর্যকিরণের মতো পথ দেখিয়ে চলেছে, সেই আলো, সেই রেখা, আমি সবসময় দেখতে পাই। তিনি ছিলেন একজন মহামানব, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ এবং তিনি একজন ওলি আল্লাহ। তিনি অনেক বই লিখেছেন, যে বই আমাদের জীবনের পাথেয়।"

শৈশব কেটেছে যশোরে

কাজী রফিকুল আলমের শৈশব কেটেছে যশোরে। বাবার বদলি চাকরির সুবাদে খুলনা, দিনাজপুর ও ঢাকায়ও কেটেছে শৈশবের কিছুটা সময়। তবে যশোরেই কেটেছে সিংহভাগ। মেট্রিক পাস করেছেন যশোর জিলা স্কুল থেকে। ইন্টারমিডিয়েট দৌলতপুর বিএল কলেজ এবং বিএসসি যশোর কলেজ থেকে। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় এসে ভর্তি হন সেন্ট্রাল ল' কলেজে। তার খালাত ভগ্নিপতি ব্যারিস্টার রফিকুল হক চেয়েছিলেন রফিকুল আলম আইন পেশায় যুক্ত হোক। কিন্তু তা হয়নি। তিনি যোগ দিলেন ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিশনে। ১৪ বছর সেখানে কাজ করেছেন বিভিন্ন পদে। প্রথমে সহকারী পরিচালক, পরে উপপরিচালক এবং ১৯৮৫ সালে পরিচালক (প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট) হন। এর আগে ১৯৮১ সালে ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে BTA ট্রেনিং প্রাপ্ত হন। ট্রেনিংকালীন সেখান থেকে ল্যাংকেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MA in Education Degree লাভ করেন। প্রায় দেড় বছর ট্রেনিং ও ডিগ্রিপ্রাপ্তির পর আসার পথে হজ্ব ও ওমরা করে আসেন। আসার পরপরই তিনি হজ্ব ও ওমরা নির্দেশিকা বইটি লিখেন। ১৯৮৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চাকরি ছেড়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে যোগ দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে।

কাজী রফিকুল আলমের শৈশব কেটেছে যশোরে। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে খুলনা, দিনাজপুর ও ঢাকায়ও কেটেছে শৈশবের কিছুটা সময়। তবে যশোরেই কেটেছে সিংহভাগ। মেট্রিক পাশ করেছেন যশোর জিলা স্কুল থেকে।

মিশনের বন্ধনে আশৈশব

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার শুরুতে তিনি ছিলেন না। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জীবিত। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

পত্রিকায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেখে নলতা ছুটে যান। সেটাই তার প্রথম নলতা যাওয়া। তখন তিনি খুলনা বিএল কলেজের ছাত্র। যশোর ও সাতক্ষীরা হয়ে নলতা পৌঁছতে প্রায় সারা দিন লেগে গেল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে প্রাইজ ফর ইনোভেটিভ লিটারেসি ফলোআপ ম্যাটেরিয়াল ১৯৯৭ পুরস্কার গ্রহণ করছেন মিশনের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম

যখন পৌঁছলেন তখন মৃতদেহ দাফনের অপেক্ষায়। দাফন হলো পরের দিন। এই সময় থেকে তার নলতা যাওয়া-আসা শুরু। এখনও প্রতি বছর ৪/৫/৬ বার পর্যন্ত যাওয়া হয়।

সেখানে সুড়কি নিয়ে, ইটের ঝুড়ি নিয়ে রাস্তা তৈরি করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, ডেডিকেশন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে মানুষ একাত্ম হতে পারে না। সিনসিয়ারিটি খুব জরুরি। কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হয়।

যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন যশোর আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনের সেক্রেটারি ছিলেন ১৯৬৫-১৯৬৭ সালে। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় চলে আসার পর যুক্ত হন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে। তখন মিশনের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসর গোলাম রহমান সাহেবের বাসায়। পরে বিভিন্ন সময়ে এ ডব্লিউ খান চৌধুরী, আলী আহমদ ও মালিবাগে জনাব মুসা প্রমুখের বাসায় ছিল। তখন সদস্যদের মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা। ১৯৭৪ সালে চাঁদা সংগ্রহের একটা বিশেষ উদ্যোগ তিনি নেন। প্রথম প্রচেষ্টায় সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া গেল ২৭৪ টাকা। কিন্তু হাল ছাড়েননি কেউ।

১৯৭৬ সালে কাজী রফিকুল আলম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবার তিনি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন। স্মৃতিচারণ করে বলেন, "মালিবাগে মাসিক ছয়শত টাকা ভাড়ায় অফিস নেওয়া হল। সেখানে প্রতিদিন সময় দিতাম। খাতাপত্র দেখতাম। তখন আমাদের মিশনে মিলাদ দিতাম, মিলাদের জন্য প্রায় এক হাজার টাকার মতো খরচ হতো, মানুষের চাঁদা দিয়ে, পকেট থেকে ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে আমরা মিলাদ দিতাম। সরকারের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। সেই টাকা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি একটা প্রকল্প করা হয়েছিল। সেই সময় ১৯৭৫ সালে শ্রদ্ধেয় আলী আহম্মেদ সাহেব মালিবাগে এককাঠা জমি দিলেন নির্মাণাধীন একতলা একটা বিল্ডিংসহ। ওই অসমাপ্ত দালান আমাদের পছন্দ মোতাবেক শেষ করলাম।"

তখন কাজী রফিকুল আলমের মূল চাকরি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনে। অফিস সময় সাড়ে সাতটা-দুইটা। প্রতিদিন অফিসের পরে সরাসরি চলে যেতেন আহ্ছানিয়া মিশনে। ডুবে থাকতেন মিশনের কাজে। দিনদিন মিশনে কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সকাল সাতটায় বাসা থেকে বের হয়ে ফিরতেন অনেক রাতে। এইভাবে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৮ সালে বুঝতে পারলেন এভাবে আর চলছে না। দুই জায়গায় কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মাদ আবদুল বারী তাকে ছাড়তে চাইলেন না। অন্য সহকর্মীরাও থেকে যেতে বললেন। তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ অফিসার হিসেবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আরও বড় কাজের দিকে তার মন ছুটে চলেছে। অনেক অনেক মানুষকে আরও বেশি বেশি সেবা দিতে হবে। ছেলেবেলায় দেখা সেই নূরানী চেহারার মানুষটি যেন তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন জীবনের সার্থকতা হলো 'স্রষ্টার এবাদত আর সৃষ্টের সেবা'। তিনি ছেড়ে দিলেন নিরাপদ আর ক্ষমতায় পূর্ণ সরকারি চাকরি। ব্যারিস্টার রফিকুল হকসহ পরিবারের অনেকেই মনে করলেন

ফিরে এসে যশোরে প্রতিষ্ঠা করেন আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনের সেক্রেটারি ছিলেন ১৯৬৫/১৯৬৭ সালে। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় চলে আসার পর যুক্ত হন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে। তখন মিশনের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসর গোলাম আহমদ'র বাসায়।

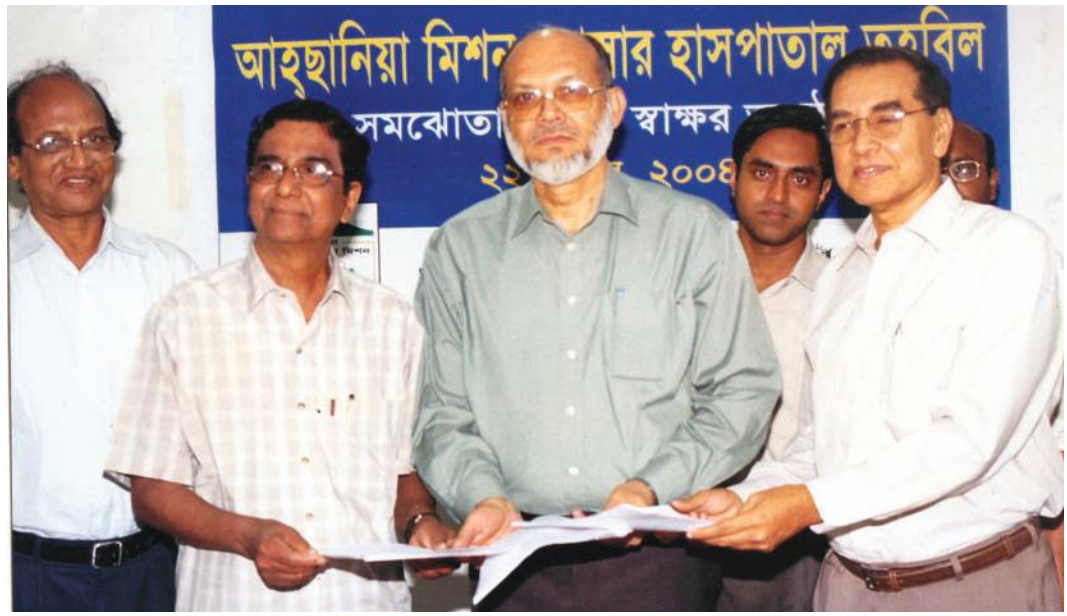

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল তহবিল গঠনে দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামসহ কাজী রফিকুল আলম

এটা তার পাগলামি, তাকে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সেক্রেটারি পদে যোগ দিতে বাধ্য করলেন তারা। কিন্তু বেশিদিন থাকলেন না। ঢাকা আহছানিয়া মিশনে যোগ দিলেন পূর্ণকালীন কর্মী হিসেবে ১৯৮৯ সালে।

কেউ কেউ তখন আড়ালে এমনটা কানাঘুষা করেছিলেন যে, ধনসম্পদ গড়ার বাসনায় তিনি মিশনে যোগ দিয়েছেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলেন, "অনেকে মনে করলেন যে আমি হয়ত, অনেক টাকা পয়সার লোভে এসেছি, কিন্তু টাকা পয়সার লোভ থাকলে কোন বড় ধরনের কাজ করা যায় না, করা সম্ভব হয় না। আজকে এতো বছর পর, যদিও উচিত না তবুও বলছি যে, আজ পর্যন্ত আমি মিশন থেকে এক পয়সা বেতন কোনো দিন নেইনি। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যা আমার নিজের সংসারে প্রয়োজন আল্লাহতায়ালা যুগিয়ে দিয়েছেন। তবে আমি যখন মিশনের কাজে যোগ দিলাম তখন থেকে আমার বাসা ভাড়াটা মিশন দিয়েছে এবং আমার চিকিৎসা খরচটা মিশন দেয়। কিন্তু যখন আমি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে গেলাম, তারপর থেকে আমি আর অফিস থেকে বাড়ি ভাড়া নেই না। এইভাবে আমার জীবন চলেছে এবং চলছে।"

মিশন ১৯৮৫ সালে প্রথম বিদেশি কাজ পায়। এটা ছিল লিটারেসি ট্রেইনিংয়ের জন্য। প্রতিষ্ঠা করা হলো ইনস্টিটিউট অব লিটারেসি এন্ড এডাল্ট এডুকেশন। সেই ইনস্টিটিউটে ISESCO নামের একটা ইসলামী প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহযোগিতা হিসেবে দুই লক্ষ টাকা দিয়েছিল। কয়েক বছর যাবত চলে এই ট্রেইনিং। এই ট্রেইনিংয়ের পর বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ইমামদের ট্রেইনিং দেওয়ার জন্য ফান্ড পাওয়া গেল, দাতা ইউনিসেফ। এইভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে মিশন।

সরাসরি ডোনার ফান্ড পাওয়া গেল ১৯৯৭ সালে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নেদারল্যান্ডস এমব্যাসি। উত্তরায় ধউর এলাকায় কাজ শুরু হয়। সেখানে অনেককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অনেককে লেখাপড়া শেখানো হয়। বাড়ি নির্মাণের জন্য যেমন একটার উপর একটা ইট দিয়ে এগোতে হয় সেইভাবে কাজগুলো হয়েছে একটার পর একটা। নির্মাণ হয়েছে মিশনের ভিত্তি। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যেমন তারা চেয়েছেন, যেমন বলেছেন, সেইভাবে এখনও এগিয়ে চলেছে মানবসেবায় নিবেদিত এই প্রতিষ্ঠানটি।

বাড়ি নির্মাণের জন্য যেমন একটার উপর একটা ইট দিয়ে এগোতে হয় সেইভাবে কাজগুলো হয়েছে একটার পর একটা। নির্মাণ হয়েছে মিশনের ভিত্তি।

নানান প্রতিষ্ঠান

মিশনের এখন ২৯টি প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য প্রকল্প। রয়েছে ক্যান্সার হসপিটাল, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেইনিং সেন্টার, মিডিয়া, ছাপাখানা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মাদক নিরাময় কেন্দ্র, পথশিশুদের জন্য শিশু নগরী ইত্যাদি।

আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হসপিটাল। এর সঙ্গে কাজী রফিকুল আলমের ব্যক্তিগত সংকটের যোগসূত্র রয়েছে। তার জবানিতে শোনা যাক, "আহ্ছানিয়া মিশনের অন্যতম একটি সেবা-প্রকল্প হলো আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। মানুষ যেন কম খরচে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের চিকিৎসা পেতে পারে- এ কথা চিন্তা করেই আমরা এত বড় প্রকল্প হাতে নিই। ক্যান্সার হাসপাতাল শুরুর গল্প আমার জন্য তেমন আনন্দদায়ক নয়। তখন ১৯৯৪ সাল। আমার জীবনসঙ্গিনীর ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ে। প্রথমেই যে ধাক্কাটা খেলাম তা হলো, বাংলাদেশে তখন ক্যান্সারের কোনো উন্নতমানের চিকিৎসাই ছিল না।

তখনই মনস্থির করলাম বাংলাদেশে বিশ্বমানের একটি ক্যান্সার চিকিৎসার হাসপাতাল গড়ে তুলবো। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৯৭ সালে সরকার উত্তরায় একখণ্ড জমি দিলেন এই হাসপাতালের জন্য।

এরই মধ্যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে ভারত, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে ছোটাছুটি চলল। পাঁচ বছর এভাবেই কেটে যায়। ১৯৯৯ সালে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তখন আমি দারুণভাবে আঘাত পাই। আমার শোকাতুর হৃদয়ে একটি কথাই বারবার বেজে ওঠে। ভাবলাম, আমার স্ত্রীকে নিয়ে এত দৌড়াদৌড়ি করলাম, কিন্তু এ দেশের সব মানুষের পক্ষে তো এভাবে ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়। নিম্ন আয়ের একজন মানুষ এত টাকা পাবে কোথায়। তাছাড়া তৎকালে আমাদের দেশে ক্যান্সারের ভালো চিকিৎসা না থাকায় বড় অঙ্কের অর্থ বিদেশে চলে যেত। অথচ চাইলে দেশের টাকা দেশেই রাখা যায়। এসব ভেবেই সরকারের দেওয়া জমিতে ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণে আরো তৎপর হয়ে উঠলাম। বাংলাদেশের জনসাধারণ এ কাজে আমাদের ডাকে সাড়া দেন। তাদের সকলের আর্থিক সহযোগিতায় এই হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে।

নতুন একটি প্রতিষ্ঠান

২০১৮ সালে অর্থাৎ মিশন প্রতিষ্ঠার ৬০তম বছরে যাত্রা শুরু করল আরো একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। নীতি-নৈতিকতা নির্ভর এ প্রতিষ্ঠানটি হলো 'সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন'। দেশে বর্তমানে নৈতিকতার ক্ষেত্রে চলছে এক ধরনের অবক্ষয়। শিক্ষার্থী সমাজকে এই অবক্ষয় থেকে মুক্ত রাখতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ কখনোই আলোকিত হবে না। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ হবে মূলত তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে। মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থী সমাজ গড়ে উঠলেই একটি জাতি সত্যিকার অর্থে অগ্রগতির লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারে।

৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রকল্পের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম

১৩ জানুয়ারি ২০১৮ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামাল

উপলব্ধি

কাজী রফিকুল আলমের উপলব্ধি হলো "জীবনে একটা আদর্শ ধারণ করলে, একজন ত্যাগী মানুষকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে নিজের জীবন উৎসর্গ করলে, সেই লক্ষ্যে কাজ করলে সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায়। অন্তত কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। আমরা যেমন আইনস্টাইন এর কথা শুনি, নিউটন এর কথা শুনি, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন অনেক গুণী মানুষের কথা শুনি, তাদের মতো হতে চাইলে, তাদের জায়গায় পৌঁছাতে গেলে একটা আদর্শ সাথে করে নিয়ে চলতে হবে। সেই আদর্শকে সবসময় ধারণ করতে হবে, তবেই আমরা আগাতে পারব। তখন দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি, ভয়-ভীতি কোনো কিছুই আমাদের টলাতে পারবে না। জয় আমাদের হবেই।"

অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস

কাজী রফিকুল আলম মনে করেন, "বাংলাদেশকে উন্নত করতে হলে, উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত করতে হলে পৃথিবীর মানচিত্রে উন্নত জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে জাতির তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রত্যেকটা কাজের নেতৃত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশে সৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে পারে তরুণ প্রজন্ম। এই ধারায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলেছি। বাংলাদেশকে পুরোপুরি গড়ে তুলতে হলে এ ধরনের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।"

নিজের জীবনের দিকে ফিরে ফিরে দেখে তিনি বলেন, "আমার জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রতি মুহূর্তে আদর্শ হিসেবে রয়েছেন। মানবসেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ধন-সম্পদ হয়তো প্রয়োজন। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। মানুষের উপকার করাটাই বড় কথা। সততা, পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতাই মানুষের বড় সম্পদ। এর মধ্য দিয়েই দেশের উন্নয়ন, মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব।"

তাঁর স্থির বিশ্বাস, "আমাদের সত্যনিষ্ঠা থাকলে, ডেডিকেশন থাকলে, সিনসিয়ারিটি থাকলে যে কোনো কাজ যে করা সম্ভব, আজকের দুর্দিনের বাজারেও, এটা কিন্তু আমি জীবনে দেখেছি, লক্ষ্য করেছি। জোর দিয়ে বলতে পারি আজ পর্যন্ত আমার কোন অসুবিধা হয় নি।"

জীবনে একটা আদর্শ ধারণ করলে, একজন ত্যাগী মানুষকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে নিজের জীবন উৎসর্গ করলে, সেই লক্ষ্যে কাজ করলে সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায়। অন্তত কাছাকাছি পৌঁছানো যায়।

প্রকৌশল শিক্ষায়
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রাকীবির রব / সৈয়দা শবনম হাসান

ঢাকা আহছানিয়া মিশন "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২" এর আওতায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে "আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" যা বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান অনুপ্রেরণা হলেন খানবাহাদুর আহছানউল্লা, প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা আহছানিয়া মিশন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।

আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর যাত্রা শুরু হয় তেজকুনীপাড়ার অস্থায়ী ক্যাম্পাসে। স্থাপত্য, পুরকৌশল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং,ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ আরও অনেক বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এর বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তেজগাঁও এর নিজস্ব সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শীর্ষ বেসরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট-এর সাবেক উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম. এইচ. খান এর প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম ও উপাচার্য এম.এইচ. খান এর যৌথ প্রচেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২" এর আওতায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে "আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" যা বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। সেই সাথে শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। মেধা, দক্ষতা ও প্রতিভা- শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টি এই তিন মাপকাঠি সর্বদাই বজায় রাখে। এই মাপকাঠির বদৌলতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আজ দেশের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি।

গবেষণা, উচ্চ-শিক্ষা, পিএইচডি ডিগ্রি লাভ, আকর্ষণীয় কর্মজীবন লাভ, দক্ষ উদ্যোক্তা হওয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিগত দুই দশক ধরে ক্রমাগত ঈর্ষণীয় অবদান রেখে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এর গ্র্যাজুয়েটরা স্কলারশিপ নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় লিপ্ত হচ্ছেন। শুধু গবেষণাই নয়, অনেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার ফার্ম ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছেন। অনেকে আত্মপ্রকাশ করছেন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে। এদের সবাইকে গড়ে তোলার পেছনে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় এর নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাদের মেধা ও মননের সাহায্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিবছর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করছেন। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বহির্বিশ্বের উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা লাভ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশ পথ

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যবহারিক শিক্ষা যার ফলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে প্রায় ৬০টি ল্যাব রয়েছে যা ভবিষ্যতে আরও বর্ধিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট আছে। প্রত্যেকটি ল্যাব আধুনিক ও প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিবছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, শিক্ষা ও ক্যারিয়ার বিষয়ক সম্মেলন, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিকনিক ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয় যা শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রতিভাকে করে বিকশিত।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে পর্যাপ্ত বই ও ইন্টারনেট সুবিধা এবং সমন্বিত আধুনিক লাইব্রেরি যা একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানচর্চা ও বিকাশে ভূমিকা পালনে সক্ষম।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ২১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে এগারো হাজার চারশ চুরাশি জন গ্র্যাজুয়েট ; তিন হাজার আটাশ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ। এদের প্রায় সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সফলতার ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছেন, দেশের ক্রমাগত উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন এবং সেইসাথে নতুন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়ে চলছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

বিজ্ঞান-মনস্ক ও সৃজনশীল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং সেইসাথে সৎ ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা কাজ করে যাবে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে প্রায় ৬০টি ল্যাব রয়েছে যা ভবিষ্যতে আরও বর্ধিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট আছে। প্রত্যেকটি ল্যাব আধুনিক ও প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, উত্তরা – একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

মো. ইফতেখারুল ইসলাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সবচেয়ে বড় সেবামূলক প্রকল্প আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল। ২০১৪ সালে ঢাকার উত্তরায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধীরে ধীরে কলেবর বৃদ্ধি করে সব ধরনের ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছে এই হাসপাতালটি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৯ মে হাসপাতাল ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই হাসপাতালের সাথে এ দেশের প্রখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞগণ জড়িত হওয়ার ফলে এটি দেশের ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বেসরকারি হাসপাতাল হিসেবে ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বেসরকারি পর্যায়ে ইউনাইটেড হাসপাতাল, স্কয়ার হাসপাতাল, খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ডেলটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল, মিরপুর এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল, উত্তরা ব্যাপক পরিসরে ক্যান্সার নির্ণয় ও ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পরও এ দেশের সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় তা বেশ অপ্রতুল। উল্লেখ্য যে, ক্যান্সার চিকিৎসায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রোগীর জন্য রেডিওথেরাপি দরকার হয়। এ ছাড়া ২০ থেকে ৩০ শতাংশের কেমোথে-রাপি লাগে। ১২ লাখ ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে রেডিওথেরাপি মেশিন রয়েছে মাত্র ১৬টি। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির (আইএইএ) মতে, প্রতি দশ লাখ মানুষের জন্য দু'টি করে রেডিওথেরাপি মেশিন প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে ৯৩ লাখ ৭৫ হাজার মানুষের জন্য (মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি হিসাবে) মাত্র একটি রেডিওথেরাপি মেশিন আছে। ন্যূনতম চিকিৎসা দেয়ার জন্য আরো কমপক্ষে ৩০টি রেডিওথেরাপি মেশিন প্রয়োজন। তাহলে কমপক্ষে প্রায় ৩৩ লাখ মানুষ একটি রেডিওথেরাপি মেশিন থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন। আর এক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতালে দুটি রেডিওথেরাপি মেশিন, ১টি কোবাল্ট মেশিন রোগীদের সেবায় কাজ করছে, যা ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় অনেকখানি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের হাসপাতালে দুটি রেডিওথেরাপি মেশিন, ১টি কোবাল্ট মেশিন রোগীদের সেবায় কাজ করছে, যা ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় অনেকখানি অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অর্থনীতির উপর ক্যান্সারের প্রভাব ব্যাপক। জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনকোলজি বিভাগের হিসাব মতে, বাংলাদেশে ৩০ থেকে ৬৫ বছর বয়সি মানুষই ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়। এ হিসাবে একটি বড় অর্থ উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীই কোনো না কোনো ক্যান্সারে ভুগে থাকেন। কিন্তু এ বয়সের (৩০ থেকে ৬৫ বছর বয়সি) জনগণই দেশের কার্যশক্তির মূল কাঠামো এবং এর একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে দেশের অর্থনীতির ওপর। উদাহরণ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে তামাকজনিত অসুস্থতার কারণে বার্ষিক খরচ প্রায় ৫০.৯ বিলিয়ন টাকা, যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ রোগী তামাকজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। অন্যদিকে তামাকক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত

বার্ষিক আয় ২৪.৮ বিলিয়ন টাকা, যা আসে তামাক ব্যবহারের উপর কর হিসেবে ২০.৩ বিলিয়ন টাকা এবং তামাক উৎপাদনের পারিশ্রমিক হিসেবে ৪.৫ বিলিয়ন টাকা। এভাবেই প্রতি বছর তামাকজনিত অসুস্থতার কারণে বার্ষিক ব্যয় তামাকক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আয়ের চেয়ে ২৬.২ বিলিয়ন টাকা বেশি হয়।

ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা এবং সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশে ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর এই কারণে বাংলাদেশ বহুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। যদি সরকার আগামী ৪ চার বছরে এর এক-চতুর্থাংশ বিনিয়োগ করে তাহলে বাংলাদেশে ক্যান্সারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক মানদণ্ডে পরিণত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উত্তরাস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ২০০। তবে, পর্যায়ক্রমে এর শয্যা সংখ্যা ২৫০ এবং পরবর্তীতে ৫০০ পর্যন্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই হাসপাতালের ভিশন ও মিশন হলো দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় এমন মানুষের জন্য ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

আমাদের হাসপাতালের ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রাখার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত ডাক্তার, নার্স ও অন্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিই। আরো উন্নততর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট স্থাপন, আরো স্বনামধন্য দেশি বিদেশি ডাক্তারদের আমাদের হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে এর চিকিৎসাসেবা আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর ক্যান্সার রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে ক্যান্সার-ই মৃত্যুর কারণ হিসেবে ৫ম স্থান অধিকার করেছিল অর্থাৎ মোট মৃত্যুর প্রায় ৭.৫ ভাগ। এটাকে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করা না হলে ২০৩০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২২ শতাংশে। অর্থাৎ প্রায় ৪র্থ স্থান অধিকার করবে এবং তখন ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ২.৫ লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১২ লাখে। তাই এই ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অর্থাৎ আমরা যদি সকলেই সচেষ্ট হই এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সবাই মিলে ক্যান্সার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি, তাহলেই ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন দেশে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানসম্মত হাসপাতাল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা, জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিকরা এবং ধূমপানবিরোধী আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগ করা।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে সাশ্রয়ী খরচে আন্তর্জাতিক মানের কান্সার চিকিৎসাসহ সব ধরনের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল আগামীতে আরো ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

লেখক: *কনসালট্যান্ট, মার্কেটিং এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, উত্তরা*

এই হাসপাতালের ভিশন ও মিশন হলো দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় এমন মানুষের জন্য ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের স্বল্প মূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

আমিক ৩৬০

ইকবাল মাসুদ

দেশের ক্রমবর্ধমান মাদকদ্রব্য সমস্যা ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে যা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। প্রথম এক দশক আমিক একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রাম ছিল। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে যারা মাদক বিরোধী কাজ করতে আগ্রহী তাদের আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। মাদকবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে এগিয়ে আসে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ। এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫৪টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় ৪০২টি শাখা কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে শাখা কমিটির মাধ্যমে আমিক-এর কার্যক্রম বাস্তাবায়িত হয়। পাশাপাশি দেশের বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সমাজ সংগঠক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে ২১ সদস্যবিশিষ্ট ২ বছর মেয়াদি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

আমিক কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিকে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ) পর্যায়ে তরুণদের নিয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা এবং নেটওয়ার্ক সদস্যদের মাদকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তরুণ সমাজের সংগে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মাদকতা বিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। দেশব্যাপী মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে পত্রিকা প্রকাশ করা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। মাদকবিরোধী কার্যক্রমের পাশাপাশি আমিক তামাক নিয়ন্ত্রণ ও এইচআইভি প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালে আমিক বাংলাদেশে প্রথম মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি যে সকল তরুণ ও যুবক ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ডিটক্স ক্যাম্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৬৭ জন আসক্তকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালে আমিক বাংলাদেশে প্রথম মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি যে সকল তরুণ ও যুবক ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ডিটক্স ক্যাম্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৬৭ জন আসক্তকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেছে। এই সেবার আওতায় চিকিৎসা পরবর্তী সেলফ হেলফ গ্রুপ গঠন ও কাউন্সেলিং করা হয়। ডিটক্স ক্যাম্পে চিকিৎসার পরে আরোগ্যপ্রাপ্তদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের পরিবারকে সেলাই মেশিন ও রিকশা প্রদান করা হয়েছে।

২০০৪ সালে আমিক এর নাম পরিবর্তন করে অ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনটিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক) করা হয় এবং আমিক মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এখন আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পর্যায়ক্রমে আমিক এর কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে; যেমন - তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, এইচাইভি এইডস্ নিয়ন্ত্রণ, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, প্রথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। বর্তমানে আমিক তিনটি মাদক চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনকেন্দ্র পরিচালনা করছে। এগুলোর মধ্যে একটি ২০০৪ সালে গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। অন্যটি ২০১০ সাল থেকে যশোরে মাদক নির্ভরশীল পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ২০১৪ সাল থেকে ঢাকায় নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

শুরু করে। আমিক শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে ২০১৬ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এছাড়া কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রিডেন্সিয়ালিং এন্ড এডুকেশন ফর এডিক্শন প্রফেশনাল (আইসিসিই) এর অ্যাপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণও প্রদান করছে আমিক। আমিক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেছে; যেমন- ভিয়েনা এনজিও কমিটি অন নারকোটিক ড্রাগ, সুইডেনের দ্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অ্যাগেইনস্ট ড্রাগ, দ্য ইন্টারন্যাশনাল অব ড্রাগ রিলেটেড অর্গানাইজেশন এবং ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অ্যালায়েন্স এর সদস্য হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য আমিক। আমিক এর কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেছে।

তিন দশকের পথ পরিক্রমায় আমিক এখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরে রূপ লাভ করেছে। এসডিজির সাথে সমন্বয় করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা পত্র (২০১৫-২০২৫) তৈরি করেছে। যার উপর ভিত্তি করেই স্বাস্থ্য সেক্টরের বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে পৃথক পৃথক ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন প্রকল্প- আরবান প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, এইচআইভি/এইডস প্রকল্প, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, ক্যান্সার চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেক্টর সেবা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম, বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করছে। বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা যেমন- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি, জাতীয় এসটিডি/এইডস এ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর এনসিডি কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন, ইউএনওডিসি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

লেখক: প্রধান, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড অ্যাডিকশন কাউন্সেলর এবং গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার, দ্য কলম্বো প্ল্যান

স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে পৃথক পৃথক ইন্সটিটিউট এবং বিভিন্ন প্রকল্প- আরবান প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, এইচআইভি/এইডস প্রকল্প, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী

এম. জাহাংগীর হোসেন

কেউ যদি জানতে চায়, আহ্ছানিয়া মিশনের অর্জন কী? আমি কোনো পদক বা পুরস্কারের কথা বলব না। আমি একবাক্যে বলব- মানুষের মুখের হাসি। এখানের প্রত্যেকটি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়ে যখন মানুষের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তখন এক অন্যরকম স্বর্গীয় আনন্দে মন নেচে ওঠে। মনে হয় পৃথিবীর সব পদক, সব পুরস্কার ওই হাসির কাছে তুচ্ছ। তাই আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব, এই দীর্ঘ সময়ে আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের ভালোবাসা এবং মুখের হাসির চেয়ে দামি আর কিছু অর্জন করেনি

বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর বস্তি, পার্ক, ফুটপাত, বাস টার্মিনাল, রেল স্টেশন এবং লঞ্চ ঘাটসমূহে ছিন্নমূল মানুষের বসবাস। এদেরই একটি বিরাট অংশ হলো পথশিশু। অবহেলা আর বঞ্চনার মাঝে ওরা ফুটপাতে বেড়ে উঠে। এদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ৬.২.৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "পথশিশুসহ সকল দরিদ্র শিশুর পুনর্বাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারিত করতে হবে"। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) 'স্রষ্টার এবাদত সৃষ্টের সেবা' মূলনীতির আলোকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষে পঞ্চগড় জেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জলাপাড়া গ্রামে কেএনএইচ জার্মানির সহায়তায় ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষে পঞ্চগড় জেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জলাপাড়া গ্রামে কেএনএইচ জার্মানির সহায়তায় ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী।

এসব শিশুদের যাদের বয়স ৬-৮ বছর তাদেরকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে শিশু নগরীতে নিয়ে এসে তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ, মানসম্মত শিক্ষা, ভরণ-পোষণ এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে এখানে রয়েছে প্রায় তিনশ' সুবিধাবঞ্চিত শিশু। প্রত্যেক শিশু ১৮ বছর পর্যন্ত এই শিশু নগরীতে থাকবে।

শিশু নগরীতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা; তাদের জন্মগত সামর্থ্য ও মেধার বিকাশের জন্য শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ; সুষম খাদ্য, নিরাপদ আবাসন, পোশাক-পরিচ্ছদ, মনোসামাজিক সহায়তা ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শিশুদের মনোভাব ও আচরণ পরিবর্তন, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, জীবনধারার ইতিবাচক পরিবর্তন এবং দায়িত্ববান সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর প্রতিটি শিশুর সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয় যাতে প্রতিটি শিশু তার পরিপূর্ণ মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় এবং যাতে শিশুরা সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেইসাথে প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত করে তার পরিবার কিংবা সমাজে পুনঃ একত্রীকরণ করা শিশু নগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে শিশুদের শরীরচর্চা

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে এরা নিরাপদ আবাসন; আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষাসহ সকল ধর্মের চর্চা; ইনডোর ও আউটডোর গেইম; গান, নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি; ছবি আঁকা, ক্রীড়া ও সৃজনশীল কাজের উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে; বই পড়া; উচ্চতর শিক্ষা; শিক্ষামূলক বিনোদন; বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের ফলে তারা ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

শিশুদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে আবাসিক কর্মী, শিক্ষক, ক্রীড়া ও মিউজিক্যাল শিক্ষক এবং মনোসামাজিক সহায়তার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্যারামেডিক ও প্রশিক্ষিত মেডিকেল অফিসার। এদের হাতে-কলমে নিয়মিত কৃষিকাজ, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন করার বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে মিনি পার্ক। পাঠদান দেয়া হয় সম্পূর্ণ আনন্দময় পরিবেশে। প্রতিটি শিশুর ডিটেইল তথ্য সংরক্ষণ এবং ঝুঁকি নিরূপণ করে তার সামর্থ্য দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে ইন্টারভেনশন প্ল্যান তৈরি করা হয় এবং সে অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ফলোআপ রাখা হয়। এখানকার শিশুরা মাতৃস্নেহে বড় হচ্ছে। শিশু নগরী এখন তাদের আপন ঠিকানা। শিশু এবং শিক্ষক মিলেমিশে একসাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে প্রতিটি অনুষ্ঠানে। দৈনন্দিন বাজার, খাবার মেন্যু পছন্দ করা, ডাইনিং ও আবাসিক ব্যবস্থাপনায় শিশুরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো পঞ্চগড় শিশু নগরীর ৬ জন শিশু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। ২ জন পেয়েছে সাধারণ বৃত্তি। একইধারা অব্যাহত রেখে ২০১৭ সালে ১০ জন শিশু পুনরায় শতভাগ সাফল্য এনে দিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পথশিশু মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শিশু নগরী প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রতিটি শিশু নগরীতে প্রতি বছর ১০০ করে দশ বছরে ১০০০ শিশু নিয়ে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১০টি শিশু নগরী গড়ে তোলা হবে যেখানে মোট ১০ হাজার শিশু সমন্বিত সেবার আওতায় আসবে। পরবর্তীতে এই শিশু নগরীর অনুরূপ মডেল সরকারি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদানে সারাদেশের প্রতিটি জেলায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হবে পৃথক পৃথক শিশুনগরী। যাতে কোনো শিশুকে আর রাস্তায় মানবেতর জীবনযাপন করতে না হয়।

লেখক: প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো পঞ্চগড় শিশু নগরীর ৬ জন শিশু প্রাথ মিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। ২ জন পেয়েছে সাধারণ বৃত্তি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

প্রফেসর ফাতেমা খাতুন

পরিসংখ্যানে দেখা যায় কর্মরত প্রায় এক লক্ষাধিক শিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণবিহীন। অথচ দেশের ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর ডিপ.ইন.এড কোর্সে বছরে সর্বমোট তিন হাজারের মতো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এরকম দুরবস্থার কিছুটা উপশম করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন ড. খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে। ১৯৯২ সালে দেশের প্রথম বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ফেরদৌস খানকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল প্রস্তুতি কমিটি, যা পরে কলেজ পরিচালনা পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য তখন প্রয়োজনীয় বইয়েরও যথেষ্ট অভাব ছিল। বিদেশি কিছু ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করে পাঠ্যসূচি চূড়ান্ত করতে হতো। তাই কাজী রফিকুল আলম মনে করলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও মানসম্মত করতে প্রয়োজন হ্যান্ড বুকের। সে কারণেই দেশের ২২ জন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ নিয়ে বি.এড ক্লাসের জন্য আবশ্যিক পাঁচটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন তিনি। আর তা বাস্তবায়িত করেন কেএটিটিসির তৎকালীন অধ্যক্ষ (রেক্টর) ড. খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বই পাঁচটি হলো- শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, শিক্ষানীতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা এবং শিক্ষার ইতিহাস। এ সব বই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এক যুগান্তকারী সংযোজন।

১৯৯২ সালে দেশের প্রথম বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ফেরদৌস খানকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল প্রস্তুতি কমিটি

প্রথম বছর চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন যার পাসের হার ছিল শতভাগ। ৩৯ জন প্রথম শ্রেণি, ৯৭ জন উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি, ৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন এবং ১ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরে সারা দেশে ১০টি সরকারি এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিটি কলেজ মিলে ১১টি কলেজের মধ্যে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন অত্র কলেজের ৫৯৭ রোলধারী শিখা লেটিসিয়া গমেজ যিনি বর্তমানে দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলিক্রস মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১ জুলাই ১৯৯৩ থেকে অন্যান্য টি.টি কলেজের মতো এ কলেজটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূরশিক্ষণের বি.এড প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন লাভ করে আমাদের কলেজ।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে একমাত্র সরকারি ছুটি ছাড়া কলেজে কোনো বন্ধ ছিল না। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত দুই শিফটে কলেজের ক্লাসসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শ্রেণি কার্যক্রমে যাতে কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে সে কারণে যে কোন রকম মিটিং, ওয়ার্কশপ সাপ্তাহিক ছুটির দিন অনুষ্ঠিত হয়। রমজানে ক্লাস ও সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত শিক্ষক-শিক্ষণের মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান ও সুনাম দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি সাড়ে পাঁচশত ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে শ্যামলীতে কলেজের মূল ক্যাম্পাসে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় সেন্ট যোশেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল,

মোহাম্মদপুর, এ দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রফেসর রওশন আরা বেগমকে। এরইমধ্যে তিনি দীর্ঘদিন দেশের বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অবসর নেন। নিয়মিত শিক্ষক সংখ্যা ৭ থেকে ১৬ জনে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৯ সালে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও তৎকালীন সময়ে দেশের প্রচলিত জাতীয় স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়।

কেএটিটিসির এই সফলতা দেখে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের কিছু ব্যবসায়ী-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি যেনতেনভাবে যত্রতত্র ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারিভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়েন। যেখানে শিক্ষার মানের দিকে বা শ্রেণি পাঠদানের প্রতি নজর দেওয়া হয় না, অর্থের বিনিময়ে এবং ভর্তি হলেই সনদ দেওয়ার লোভনীয় প্রচারণায় মেতে ওঠেন তারা।

আমাদের কলেজের বৈশিষ্ট্য

- কলেজ প্রাঙ্গণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত।
- কোনো প্রকার ক্লাব এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন নেই।
- কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে আন্তঃদলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত রেখে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের সফল পরিচালনা এবং সক্রিয় শিক্ষার্থী পরামর্শের (কাউন্সেলিং) ব্যবস্থা।
- বর্ষশেষে সাংস্কৃতিক সপ্তাহে সকল দলের শিক্ষা উপকরণ ও দেয়ালিকাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী করা এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা।
- ক্লাসের স্থিতিকাল (পিরিয়ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক।
- পাঠদান অনুশীলনীর সময় নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রসারণ (সিলেবাস বহির্ভূত) বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং শুক্রবারসহ সপ্তাহে ৬ দিন নিয়মিত ক্লাস।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নিং বডি কর্তৃক পরিচালিত।

বর্তমানে কলেজটি তার সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে পেছনে ফেলে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও শিক্ষাপোযোগী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার্থীরা যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তিগত, নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যবোধ ও সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ে যান। যদিও সরকারিভাবে জোরেসোরে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন সব মিলিয়ে ৮ লাখের মতো শিক্ষককে এত অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। শিক্ষকদের এই দুরবস্থার বিষয়টি উপলব্ধি করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বি.এড ও এম.এড কোর্সে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের ২০১৩ সাল থেকে বি.এড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সফলতার সাথে তাদের বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকদের আই.সি.টি, ডিজিটাল ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ও বিষয় জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে (ওয়ার্কশপ, সেমিনার) প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কেএটিটিসি। এছাড়া শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য কিছু জীবনদক্ষতা বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধার লক্ষ্যে কেএটিটিসির নিজস্ব জমির উপর নির্মিত চারতলা ভবনটি ভেঙে আরো বড় পরিসর ও আধুনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা প্রতিনিয়তই প্রমাণ করেছে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তার পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের দ্বারা।

লেখক: অধ্যক্ষ কেএটিটিসি

সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকদের আই.সি.টি, ডিজিটাল ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ও বিষয় জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে (ওয়ার্কশপ, সেমিনার) প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কেএটিটিসি।

উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

এস. এম. নজ্মুদ্দীন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক 'উন্নয়নের মূলধারায়' স্লোগান সামনে রেখে ২০ মে ২০১৩ থেকে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটি আহ্ছানিয়া প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪, আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হয়।

আলোকিত বাংলাদেশ সংবাদ পরিবেশনে সত্য, বস্তুনিষ্ঠ, স্বাধীন ও নির্ভীক। এর সম্পাদকীয় নীতি উদার ও নিরপেক্ষ।

আলোকিত বাংলাদেশ সম্ভাবনার বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে আনুষ্ঠানিক পথ চলার শুরু থেকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতা পত্রিকায় তুলে ধরে তথা দারিদ্র্যবিমোচনে নানামুখী কর্মকাণ্ড, উদ্ভাবনধর্মী নানা পেশার মানুষের সাফল্যগাথা তুলে ধরছে। প্রতিদিন সুসংবাদ শিরোনামে দেশের উন্নয়নমূলক একটি বিশেষ আয়োজন নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছে।

দেশের ও প্রবাসের ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও পাঠকদের নিয়ে আলোকিত বন্ধু ফোরাম গঠিত হয়েছে। ফোরামের বন্ধুরা অসাম্প্রদায়িক, মানবিক চেতনা বিকাশে সামাজিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখছেন।

প্রবীণদের সঙ্গে এবং শিশুদের পাশে থেকে আলোকিত বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। সমসাময়িক নানা ইস্যু নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। সেসব বিশেষ কর্মকাণ্ড বা দিবসের ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ (১. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, ২. আশ্রয়ণ প্রকল্প, ৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ, ৪. শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, ৫. নারীর ক্ষমতায়ন, ৬. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, ৭. কমিউনিটি ও মানসিক স্বাস্থ্য, ৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ৯. বিনিয়োগ বিকাশ এবং ১০. পরিবেশ সুরক্ষা) পত্রিকায় রিপোর্ট করে ও মন্ত্রিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশের মাধ্যমে আলোকিত বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে।

দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিবেদন, কলাম, উপসম্পাদকীয়র মাধ্যমে তুলে ধরে এসব কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে যাচ্ছে আলোকিত বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আলোকিত প্রযুক্তি পাতায় তুলে ধরছে নানা বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। আইটি সম্পর্কে নানা সচেতনতামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

আলোকিত বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। তাইতো মহান বিজয়ের সাফল্যকথা 'বিজয়ের মাস' শিরোনামে প্রতি ডিসেম্বরে বিশেষ আয়োজনে গুরুত্বসহ মাসব্যাপী রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে এবং স্বাধীনতার মাসে 'উত্তাল মার্চ' শিরোনামের কলাম প্রকাশ করে প্রতি বছর।

পত্রিকাটি এবার ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পন করেছে।

লেখক: *প্রশাসনিক কর্মকর্তা, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*

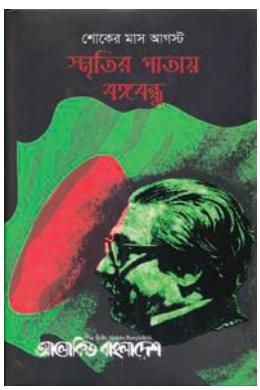

আলোকিত বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। তাইতো মহান বিজয়ের সাফল্যকথা 'বিজয়ের মাস' শিরোনামে প্রতি ডিসেম্বরে বিশেষ আয়োজনে গুরুত্বসহ মাসব্যাপী রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশিত বই প্রধানমন্ত্রীকে প্রদান

'শোকের মাস আগস্ট, স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু' বইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদান করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশিত 'শোকের মাস আগস্ট, স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু' বইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদান করা হয়েছে। বইটি ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ জাতীয় সংসদ ভবন কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান এবং স্কয়ার হাসপাতালের পরিচালক (স্বাস্থ্যসেবা) মির্জা নাজিম উদ্দিন। জাতির জনকের শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এ ২০১৬ ও ২০১৭ সালের আগস্টে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী-সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, কলাম লেখকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণ, বিশেষ সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ওইসব লেখার সমন্বয় 'শোকের মাস আগস্ট, স্মৃতির পাতায় বঙ্গবন্ধু'। বইটির গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন যুগ্মসম্পাদক কাজী আলী রেজা। বইটির প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম।

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীর জন্য 'ফিজিওলজি এন্ড ফার্মাকোলজি ফর এডিকশন প্রফেশনালস' এবং 'ট্রিটমেন্ট ফর সাব্সটেন্স ইউজ ডিসঅর্ডারস-দি কনটিনিয়াম অব কেয়ার ফর এডিকশন প্রফেশনালস'-এর ওপর আট দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২৫ মার্চ ২০১৮ রাজধানীর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেল্থ সেক্টর এর নিজস্ব ভবনের ট্রেনিং রুমে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৮ মার্চ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মফিদুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সাবেক আবাসিক চিকিৎসক ও মাস্টার ট্রেইনার ডা. আখতারুজ্জামান সেলিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) ক্রেডেন্টশিয়ালিং পরীক্ষায় সফলভাবে

'ফিজিওলজি এন্ড ফার্মাকোলজি ফর এডিকশন প্রফেশনালস' এবং 'ট্রিটমেন্ট ফর সাব্সটেন্স ইউজ ডিসওরর্ডারস-দি কনটিনিয়াম অব কেয়ার ফর এডিকশন প্রফেশনালস'-এর ওপর আট দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে ২৫ মার্চ ২০১৮।

উত্তীর্ণ হওয়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রথম ব্যাচের অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান এবং দ্য কলম্বো প্ল্যানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মাদকাসক্তির সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্যগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে এনে সমস্যার সমাধান করা এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আসছে। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) কর্তৃক বাংলাদেশে অ্যাপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৮ মার্চ।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল

লটারি ২০১৮ ড্র অনুষ্ঠিত

১০ মার্চ ২০১৮, ধানমন্ডিস্থ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রথম পুরস্কার জয়ীর নম্বর ঞ ০৫০২৮০১। ২য় পুরস্কার ১টি ৫ লক্ষ টাকা জয়ীর নম্বর ঞ ০০৫৭৬৯০। ৩য় পুরস্কার ১টি ১ লক্ষ টাকা জয়ীর লটারি নম্বর ক ০৩০৪৫৩০।

পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত মোট ৮ শ্রেণীর (১ম হতে ৮ম পর্যন্ত) পুরস্কারের মধ্যে ৪র্থ হতে ৮ম পর্যন্ত পুরস্কার সকল সিরিজের টিকিটের জন্য প্রযোজ্য হবে।

লটারিতে ১০ হাজার টাকা মূল্যের ৪র্থ পুরস্কার ১০টি বিজয়ী নম্বর ০০৯০৫৫৩ (ক থেকে ঞ পর্যন্ত প্রযোজ্য)। ৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫ম পুরস্কার ১০টি নম্বরগুলো বিজয়ী নম্বর ০১৬৪২৪৫ (ক থেকে ঞ পর্যন্ত প্রযোজ্য)। ৬ষ্ঠ পুরস্কার ১০টি ৩ হাজার টাকা (প্রতিটি)। ৬ষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী নম্বর ০৪৮২৯৯৭ (ক থেকে ঞ পর্যন্ত প্রযোজ্য)। ৭ম পুরস্কার ১০টি ২ হাজার টাকা (প্রতিটি)। ৭ম পুরস্কার বিজয়ী নম্বর ০১৬৯৯৮১ (ক থেকে ঞ পর্যন্ত প্রযোজ্য)। ৮ম পুরস্কার ২০০টি ১ হাজার টাকা (প্রতিটি)। ক থেকে ঞ পর্যন্ত ১০টি সিরিজই প্রযোজ্য। ৮ম পুরস্কার যথাক্রমে- ০৪৪৬৫৭২, ০৮৩৯৪৪১, ০৮৫২১৫৫, ০০১২০০২, ০২৮৬৭৪১, ০০৯৭০৬১, ০২১৭২৮১, ০২৮৩২৬৯, ০১০০৪৩৫, ০২৭৭৯০৭, ০৬৩১৬৮২, ০৬৫২০৫০, ০৩৩৯৫৯৬, ০৩৮৬৪৪৫, ০৮৪১৩৪৮, ০২৪৭৬৪০, ০৪২৮৬৫১, ০১২১৫১২, ০৩৮৭২৬২ ও ০১৮৮৯০৪ নম্বর।

উল্লেখ্য, ৯ এপ্রিল ২০১৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা কাজের উদ্বোধন করেন। ১৫তলা বিশিষ্ট এই ক্যান্সার হাসপাতালটি সম্পূর্ণরূপে চালু করার জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন। সে লক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের তহবিল গঠনের জন্য ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে

৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রথম পুরস্কার জয়ীর নম্বর ঞ ০৫০২৮০১। ২য় পুরস্কার ১টি ৫ লক্ষ টাকা জয়ীর নম্বর ঞ ০০৫৭৬৯০। ৩য় পুরস্কার ১টি ১ লক্ষ টাকা জয়ীর লটারি নম্বর ক ০৩০৪৫৩০।

চতুর্থবারের মতো সরকার অনুমোদিত আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল লটারি-২০১৮-এর টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়। ৩০ দিনের মধ্যে পুরস্কারের জন্য বিজয়ীর নাম, ঠিকানা, সত্যায়িত ছবি ও টিকিটসহ লিখিত দাবি লটারি পরিচালনা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। ডাকযোগে প্রেরিত টিকিট অপ্রাপ্তির জন্য লটারি পরিচালনা কমিটি দায়ী থাকবে না।

ড্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লটারি পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ মুনির হোসেন এবং সদস্য সচিব অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) মোঃ নজরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের জি এম মো. মাছুম পাটোয়ারী, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপসচিব (স্ট্যাম্প) ডা. মো. হামিদুল হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন) আনোয়ার হোসেন চৌধুরীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি দল।

এইউএসটির দশম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

উচ্চশিক্ষায় নতুন মাত্রা এনেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বিকল্প মাধ্যমের উদ্ভাবন, বিশ্বায়নের প্রতিফলন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতকরণ, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার ও নতুন কার্যক্রমের সূচনা। এসব বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট নিরসনপূর্বক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিতকরণে ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার গুরুত্ব দিয়ে এ সেক্টর তদারকি করছে।

৯ জানুয়ারি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এইউএসটি) দশম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করা ১ হাজার ৪৪০ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ১ হাজার ২৬১ এবং স্নাতকোত্তরে ১৮৫ শিক্ষার্থী রয়েছেন। সমাবর্তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির দুইজন কৃতী ছাত্রী। তারা হলেন সিএসই বিভাগের (স্প্রিং-২০১৬) ছাত্রী অনিকা সায়েরা এবং একই বিভাগের (ফল-২০১৬) ছাত্রী মেহজাবীন ইমু। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

সমাবর্তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির দুইজন কৃতী ছাত্রী। তারা হলেন সিএসই বিভাগের (স্প্রিং-২০১৬) ছাত্রী অনিকা সায়েরা এবং একই বিভাগের (ফল-২০১৬) ছাত্রী মেহজাবীন ইমু।

এ সেশনে তারা সর্বোচ্চ সিজিপিএ লাভ করায় এ পদক লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়া শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য, যা অর্জনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষা খুবই জরুরি। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সহায়তা করবে।

সমাবর্তনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও এক্সিকিউটিভ ভিসি ড. মোহাম্মদ এ করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম সফিউল্লা। এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলমসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

১০ লাখ টাকা দান করলেন আবদুল মালেক

রাজধানীর উত্তরায় নির্মাণাধীন ৫০০ বেডের বিশ্বমানের আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ তহবিলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক সহকারী প্রকৌশলী আবদুল মালেক ১০ লাখ টাকা দান করেন।

২৭ মার্চ ২০১৮ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক সহকারী প্রকৌশলী আবদুল মালেক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের হাতে ১০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল হাই। এই দানের মাধ্যমে আবদুল মালেক আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের আজীবন সদস্য হলেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম আবদুল মালেককে হাসপাতালের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। আবদুল মালেক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এমন একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

২৭ মার্চ ২০১৮ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক সহকারী প্রকৌশলী আবদুল মালেক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের হাতে ১০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন।

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত)

HAJJ FINANCE COMPANY LIMITED حج فاينانس كمبانى لميتيد

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

শরিয়াহ্ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় স্কীম

হজ্ব পালন ও
হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প

বাড়ি অর্থায়ন

গাড়ি অর্থায়ন

শিল্প অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে
অর্থায়ন

আমানতসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মাসিক কিস্তি ভিত্তিক মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৩. এককালীন মুদারাবা হজ্ব টার্ম ডিপোজিট
৪. হজ্ব ডেভেলপমেন্ট মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৫. মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট
৬. মুদারাবা পেনশন ডিপোজিট স্কীম
৭. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মেল্‌ক
৪. মুসারাকা মুতানাকিসা
৫. মুরাবাহা লোকাল পারচেজ অর্ডার
৬. আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

পণ্য

- গাড়ী (প্রাইভেট ও কমার্শিয়াল)
- যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
- ব্যবসা বাণিজ্য
- বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

"লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক"

(হে আল্লাহ, আমি তোমার সান্নিধ্য লাভে হাজির হয়েছি)।

আস্-সাফারী

(হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

"আমাদের আর্থিক সহায়তায় পবিত্র হজ্ব পালন করুন পরে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করুন"

বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন

প্রধান কার্যালয় ও প্রধান শাখা

ফজলুর রহমান সেন্টার (নীচ তলা), ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন: +৮৮-০২-৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৭১৬৫৯০০; ফ্যাক্স: ৯৫৬৮৯৭৩।

বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্স শাখা

মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা), উত্তর গেট, ৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন : +৮৮-০২-৭১৬৯৬৫৯, ৭১১৪৩৬১; ফ্যাক্স: ৭১১৮১৯৮।

www.amhajjfinance.com

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪০ ● সংখ্যা ১ ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০